১০ই

নভেম্বর '৮৩

স্মরণে

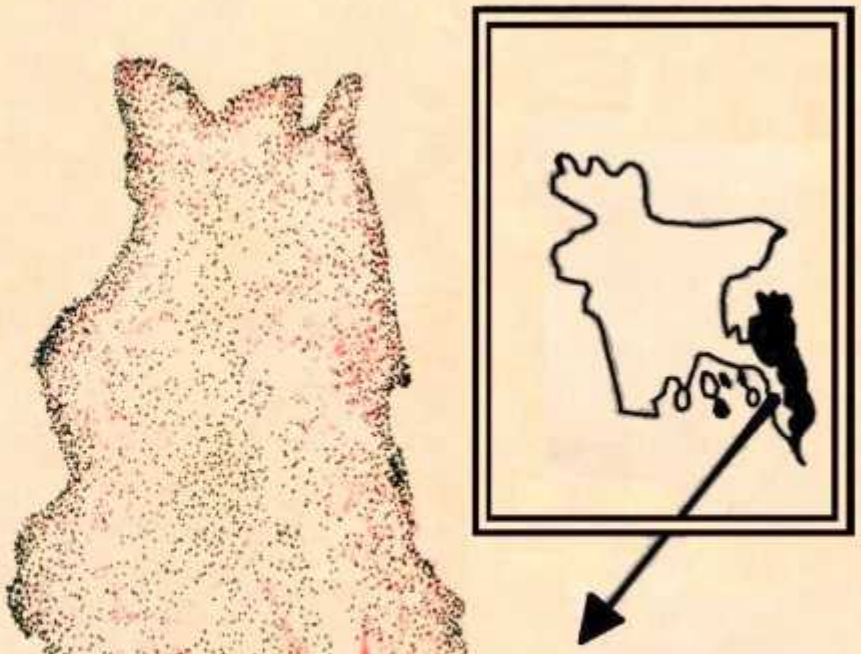

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

জনসংহতি সমিতি

'ফেরার পথে'

১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম
জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর, ১৯৮৫ সংকলন

"পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।"
—জনসংহতি সমিতি

প্রচ্ছদ শিল্পী—শ্রীঅঙ্কন

"যে যত আদর্শবান, সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী
সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শী হতে পারে।"
—এম, এন, লারমা

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির
তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক
প্রকাশিত ও প্রচারিত।

দু'টি কথা

"১০ই নভেম্বর"— বিশ্বাস ঘাতকতা, ঘৃনা ও কলংকের সাক্ষ্য বহনকারী এক অবিস্মরণীয় দিন। কালের আবর্তনে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে শোকাবহ ও মর্মান্তিক এই দিনটি আবারো আমাদের মাঝে হাজির হয়েছে। আজ ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৫ সাল। জুম্মজাতির কর্ণধার, জাতীয় জাগরনের অগ্রদূত ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী।

গৃহযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াজনিত প্রতিকূলতা এখনও পুরোপুরী কাটিয়ে উঠা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। অনেক অনেক বাধাবিপত্তির মুখোমুখি থেকেও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আজ প্রয়াত নেতার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করছে। এই উপলক্ষ্যেও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মোৎসর্গীকৃত শহীদদের স্মরণে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে "১০ইনভেম্বর' ৮৩ স্মরণে" প্রকাশিত হলো।

আজ থেকে ঠিক দু' বছর আগে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদের দোসর— গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র "ক্ষমা কর ও ভুলে যাওয়া" নীতির ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত চরমভাবে পদদলিত করে ১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৮৩ইংরেজী এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালিয়ে জুম্মজাতির অবিসংবাদী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ সমিতির অন্য আটজন আদর্শবান ও একনিষ্ঠ বিপ্লবীযোদ্ধা পরিমল বিকাশ চাকমা, শুভেন্দু প্রবাস লারমা, অপর্ণাচরন চাকমা, অমরকান্তি চাকমা, মনিময় দেওয়ান, সৌমিত্র চাকমা ও অর্জুন ত্রিপুরাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে।

পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায়ে নিজেদের দুর্নীতি, ব্যাভিচার ও অপরাধ ঢাকবার উদ্দেশ্যে এবং দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক গুপ্তচর ও দালালদের কুমন্ত্রনায় চারকুচক্রী যে অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধের অবতারনা-করে, সেই গৃহযুদ্ধের সুযোগে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী শত শত জুম্ম নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করেছে হাজার হাজার জুম্ম নরনারীকে, অনেক নিরীহ জুম্মকে হত্যাও শত শত ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে এবং অগণিত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

দু'টি বছরের গৃহযুদ্ধে অনেক রক্ত ঝরেছে। চারকুচক্রী উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়ে পড়ে। গৃহযুদ্ধে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন-শান্তিবাহিনী—সদস্যদের একদিকে চারকুচক্রীর সশস্ত্র অনুগামী বাহিনী অন্যদিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী—এই দুই সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে সমানে লড়ে যেতে হয়েছে। বীর যুদ্ধা—দীপেন, জীবন, সৈকত, নরেশ, প্রভাত, রুদ্র, রাম, সুকান্ত, রোমেল, বিশ্ব, গতি, বিনয়, ঈমান, সুদর্শন, দীনেশ, লাম্বা, ছন্দক, নতুনজয়, সবুজ, নিকোবর, প্রতাপ ও এ্যাপোলো অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধে নিজেদের অমূল্য জীবনের আত্মাহুতি দিয়ে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে আদর্শনিষ্ঠা, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতীয় বেঈমান বিভেদপন্থীদের সহিংস তাণ্ডবতায় জুম্ম জনগণের অনেকেই হয়েছেন লুণ্ঠিত, পঙ্গু, আহত অথবা নিহত। লাঞ্ছিতা হয়েছেন অনেক মা-বোন। সমগ্র জাতীয় জীবন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত ও সন্ত্রস্থ।

জাতীয় জীবনে এই মর্মান্তিক ও শোকাবহ দিনে জনসংহতি সমিতি আজ পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে প্রয়াত নেতার ঐতিহাসিক অবদানের কথা গৃহযুদ্ধের কারণে ও গৃহযুদ্ধ চিরতরে অবসান করতে গিয়ে যাঁরা নিজেদের

অমূল্য জীবনের আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি জনসংহতি সমিতির পরম শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করছে। এছাড়া সকল শোকসন্তপ্ত গভীর পরিবার-পরিজনসহ জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে যাঁরা আহত ও পঙ্গু হয়ে দুর্বিসহ জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন, যাঁরা শত্রুর কারাগারে ও বন্দীশালায় সীমাহীন দুঃখ-কষ্টে রয়েছেন এবং যাঁরা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও পাশবিক অত্যাচারে শিকার হয়েছেন—তাঁদের সকলের প্রতি জনসংহতি সমিতি জানাচ্ছে গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

গৃহযুদ্ধের অমানিশা সাময়িক বিদূরীত হয়েছে। গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা, তাণ্ডবতা ও নিষ্ঠুরতা আজ আর নেই। জনীয় নেতার সুযোগ্য নেতৃত্বে পার্টির নীতি আদর্শে উজ্জীবিত গণবাহিনী তথা সমগ্র কর্মীবাহিনী আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকামী সচেতন জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে চারকুচক্রী ও তাদের পদলেহী অনুগামীদের আঘাতের পর আঘাত হেনে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছে। অনাকাঙ্খিত এই গৃহযুদ্ধের আসানে জুম্ম জনগণ আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে; পার্টির অভ্যন্তরে যে সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব ছিল সেটার মূলোচ্ছেদ ঘটেছে; দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক গুপ্তচর দালালদের স্বপ্ন চুড়মার হয়ে গেছে এবং জুম্ম জনগণ আরো আশাবাদী ও সংগ্রামী হয়ে উঠেছেন। সর্বোপরি পার্টির নেতা, নেতৃত্ব ও ব্যাপক কর্মীবাহিনী এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং আগের যে কোন সময়ের চেয়ে পার্টি আজ আরো বেশী ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

যুগে যুগে অন্যায় অনাচারের পতন ঘটেছে। পক্ষান্তরে ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে। ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী জাতীয় বিশ্বাস ঘাতক ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম-বাহিনী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের পরিণতি ও তাই হয়েছে। যে কোন প্রকারে উপদলীয় চক্রান্ত অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে পার্টি আজ সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ।

গৃহযুদ্ধ তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ এটাই প্রমান করেছে যে প্রয়াত নেতার প্রদর্শিত নীতি আদর্শের ভিত্তিতেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এগিয়ে নিতে পার্টি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সুসংহত।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে গৃহযুদ্ধ ও তার ফলাফল—	শ্রীপেলে—১
২।	স্মৃতি—	শ্রীমনোজ—৯
৩।	আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের রূপরেখা—	শ্রীজিমি—১৩
৪।	একজন বিভ্রান্ত কর্মীর গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা—	শ্রীকুশল—২০
৫।	আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে আপনার ভূমিকা—	শ্রীঅলোপ—২৪
৬।	দিবা স্বপ্ন—	শ্রীপ্রজিৎ—৩২
৭।	সাধের স্বপ্ন রাজ্য—	শ্রীসঞ্জয়—৩৩
৮।	A genesis of the movement for Self-determination of the Jumma people of Chittagong Hill Tracts and its future—	chree Uttaran—৩৪
৯।	১০ই নভেম্বর আমি দেখেছি—	শ্রীসৌরভ—৪৭
১০।	কিছু কথা	শ্রীনয়ন—৪৮
১১।	আমার চোখে মানবেন্দ্র লারমা—	শ্রীরেণী—৫০
১২।	আত্মনিয়ন্ত্রাণধিকার আন্দোলন এগিয়ে যাবেই—	শ্রীদেবাশীষ—৫৪
১৩।	জীবনের জন্যই সংগ্রাম—	শ্রীসানী—৫৮
১৪।	সেই ভদ্রলোকটি—	শ্রীঅংজয়—৬৪
১৫।	মুক্তির ডাক—	শ্রীবিদুবিনাশণ—৬৫
১৬।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ—	শ্রীরবি—৬৬

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচার

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে গৃহযুদ্ধ ও তার ফলাফল

—শ্রীপেলে

রক্তাক্ত জনপদ—বঞ্চনার ইতিহাস—ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান আর আহত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সমূহের আবাস-ভূমি এই পার্বত্য চট্টগ্রাম আবহমানকালের সামন্ত ও উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতি যেমনি হয়েছিল পঙ্গু ও বিপর্যস্ত, অনুরূপ উপর্যুপরি ষড়যন্ত্রের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তার রাজনীতি। সেই প্রেক্ষিতে ক্ষত বিক্ষত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর পুরো অবয়বটায় ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় এসে পড়ে। বৃটিশ শাসনের অনুবর্তী উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শাসিত অপরাপর যে কোন অঞ্চলের চাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সার্বিকভাবে স্বতন্ত্র ও পশ্চাৎপদ কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, পাকিস্তান আমলে ফ্যাসিবাদী শাসনের ছত্রছায়ায় জুম্ম জনগণের জন্য কোন রকম আলাদা সুযোগ সুবিধা তো দেওয়াই হয় নি বরঞ্চ পূর্বকালীন সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব করে দিতে উগ্র ধর্মান্ধ পাক সরকার বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে। অধিকন্তু তৎপরবর্তী উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারনবাদী বাংলাদেশ সরকারের শাসন হয়ে উঠে আরো বেশী ক্ষিপ্ত আরো বেশী বন্যতায় ভরা, যেখানে এক কলমের খোঁচায় সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারকে ধূলিসাৎ এমন কি সমগ্র জুম্ম জাতির অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘোষণা করে হয় দেওয়া সাংবিধানিক উপায়ে। জুম্ম জনগণের এই অবস্থা সত্বেও বাংলাদেশের বামপন্থী দক্ষিণপন্থী মধ্যপন্থী ইত্যাদি নানান ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের মধ্যেও কোন একটি দলই জুম্ম জাতির এই আসন্ন সমস্যাকে আলাদা ভাবে বিচার করে এগিয়ে আসে নি। এই সব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার কয়েকটি দল বড়জোর মৌখিক সমর্থন হয়তো বা দু' একটা মামুলী প্রস্তাব গ্রহণ করে তা কাগজের মধ্যেই সীমিত রাখতো অথচ জুম্ম জাতি ততক্ষণে মুলোচ্ছেদ হয়ে অবধারিত ধ্বংসের মুখে পৌঁছেছিল। নিশ্চিৎ এ ধ্বংসের পথ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তার প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক সংগ্রামের কিন্তু সম্যক উপলব্ধির অনুপস্থিতিতে আবশ্যকতা ছিল অর্থহীন; কেননা নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী শক্তিধর নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তার উপরি কাঠামো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থায় বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেন। অবশেষে তিনি বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীন এবং সবচেয়ে সুসামঞ্জস্য ও প্রগতিশীল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন এবং জুম্ম জনগণের দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী অংশকে সাথে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ধ্বংসপ্রায় জুম্ম জাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করলেন—পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মজাতির বেঁচে থাকার একমাত্র সনদ ও রাজনৈতিক অবলম্বন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

জন্মলগ্ন থেকে সমিতি ঘোষণা করে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে দশটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি জাতি সমূহের আবাসভূমি।

অতএব তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে—

১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষাভাষি জাতি সমূহের মধ্যে ভেদাভেদ, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও শোষণ বন্ধ করা;

২) এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা;

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;

এইসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনসংহতি সমিতি জন্ম ভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করতে বদ্ধ পরিকর। তাই মানবজাতির সবচেয়ে প্রগতিশল আদর্শ মানবতাবাদ' পার্টি গ্রহণ করেছে। আর এই মানবতাবাদ—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সংগ্রামের নীতি ও কৌশল ঠিক করার আগে প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি শত্রু ও মিত্র ইত্যাদির বাস্তব অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করার পরই সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্দ্ধারণ করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ যেহেতু যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ এবং যেহেতু শত্রুও আমাদের তুলনায় সবদিক দিয়ে বেশী শক্তিশালী তাই নিজেদের প্রতিষ্ঠায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে অগ্রসর হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। জুম্মজাতি দীর্ঘদিন ধরে সামন্ত ও উপনিবেশিক শাসনে শাসিত হয়ে আসছে; যেহেতু ঐ শাসিত শ্রেণী থেকে সংগ্রামী ও অধিকার সচেতন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার অর্জন করতে তার যথেষ্ট সময়ের দরকার। এ সময়ের

পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি সংগ্রামের এই নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করেছে যে—

১) নীতিগতভাবে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া এবং কৌশলগতভাবে জাতি ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে সাহায্য চাওয়া;

২) নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করা এবং কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা।

কিন্তু মানবতার শত্রু জাতীয় বিশ্বাসঘাতক-গিরি-প্রকাশ দেবেন, পলাশ চক্র এই প্রগতিশীল আদর্শ ও নীতি কৌশলকে গ্রহন করতে পারে নি। তারা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা চালিয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে গলা টিপে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারনবাদী শিবিরে শক্তি বৃদ্ধিতে 'পঞ্চম বাহিনী'র ভূমিকা পালন করতে থাকে। তাই দেশী-বিদেশী গুপ্তচরদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে চার কুচক্রী এই জুম্ম জাতির সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে—সভ্য দুনিয়ায় এই পর্যন্ত অসংখ্য মতবাদের উদয় ও বিলয় ঘটেছে। এইসব মতবাদের ঘনঘটায় পাক ভারতে এক সময়ে যে রাজনৈতিক উদ্গীরণ ঘটেছিল, তারই ছিটকে পড়া ও স্খলিত অবশিষ্টাংশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শিশু মস্তকের মত এইসব অশোধিত মতবাদ যেখানের প্রভাব ফেলেছে সেখানে রাজনৈতিক প্রহেলিকায় সৃষ্টি হয়েছে। এইসব দিগ্বিদিক্ষিপ্ত মতবাদ পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু কিছু তরুণ বিপ্লবীদের রক্তে সংক্রমিত হলে এখানেও রাজনীতির ভাবালুতা ও রোমান্টিকতা দেখা দেয়। সেই রোমান্টিকতা এমনই সন্দর্ভ ব্যাপার যা ইলাষ্টিকের মতই ভাবাবেগে উৎসারিত হয়ে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের রূপ পরিগ্রহ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতেও যখন মধ্যযুগীয় জঞ্জাল; প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান ধারণায় নিহিত সামন্তবাদের বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে সামিল হয়ে কিছু চঞ্চল মতি তরুণ র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তনের প্রত্যাশায় যত্র তত্র আত্মঘাতমূলক কাজ করতে হস্ত দস্ত হয়ে উঠে। ঘুণে ধরা সামন্ত ও উপনিবেশিক নেতৃত্ব ও শাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার কণ্ঠে শ্লোগান তুলতে চেয়েছিল, পুরানো নেতৃত্ব ও শাসনের অভিশাপ দিয়ে ছিল, উদ্দীপীত হয়েছিল উন্নততর এক ব্যবস্থার কল্পনায়, আর জুম্ম জনগণকে বোঝাতে চেয়েছিল বিপ্লবের পথ তারা দেখাবে। কিন্তু সত্যিকারের মুক্তির পথ তারা দেখাতে পারে নি, জাতিগত নিপীড়নের যুগে আন্দোলনের রূপটা কি তাও তারা দেখাতে পারে নি এবং খুঁজে পায় নি জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সত্যিকারের ক্ষমতার উৎস যা গোটা সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

বহু পাক বিপাকের মধ্যে নিষ্ফল মরিয়া প্রচেষ্টা ছাড়া সাফল্যের একটা খতিয়ান ও তারা দাঁড় করাতে পারেনি। অবশেষে নিজেদের অপরিপক্কতাকে শানায়ে নেবার প্রত্যাশায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সন্তু লারমার নেতৃত্বে পরিচালিত জনসংহতি সমিতিতে যোগ দেয়। এই সব বিভ্রান্ত অথচ তরুণ উদ্যমী কর্মীদের পেয়ে সমিতির নেতৃত্ব নিপুনতার সাথে কাজে অগ্রসর হয় খুবই দ্রুত গতিতে। রোমান্টিকতায় মদমত্ত এই সব বিপ্লবীরা দলের অভ্যন্তরে দেখতে পায় বহু ঘাটতি; বলা বাহুল্য বহু টানা পোড়নের মধ্যেই এই সমিতির যাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক রোমান্টিকতা যার চিন্তার প্রনালীতে একবার সংক্রমিত হয়েছে তার মোহমুক্তি আর সহজ নয়। অতএব তাদের অনেকে কেউ রাজনৈতিক কেউ কেতা, কেউবা সামরিক নেতা হবার উচ্চাশায় কাজে নেমে পড়ে যায়। যার ফলে দিনকে রাত কিংবা ঠিক বেঠিকের মধ্যে ঘূর্ণায়মান তালগোল পাকিয়ে ফেলতে থাকে। তাদের সেই বেপরোয়া কার্যকলাপ উত্তুঙ্গে উঠে যখন লারমার তুখোড় সহকারী, ফিল্ড কমাণ্ডার সন্তু লারমা শত্রুর হাতে বন্দী হন। কিন্তু লারমার কর্মবাদী নীতি যে কাউকেই হোক কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয়ে গড়ে উঠার দাবী রাখে। ১৯৭৬ সালের র‍্যাডগং অভিযানে টন পাঁজুরে নেতা গিরির ব্যর্থতা, ৭৭ সালে মাহলাটির এম এন গ্রুপ অভিযানের ব্যর্থতা, ৭৯ সালে ফক্কিকারী পলাশের বগাপাড়া অপারেশনের লজ্জাজনক ব্যর্থতা '৮১ সালে ইঁচরে পাকা নেতা দেবেনের 'টি' জোন অভিযানের ব্যর্থতা আর প্রকাশ্যের তথাকথিত মুরুব্বিয়ানা ও অহেতুক সৌখিন কাজে ব্যস্বতার বাড়াবাড়ি শেষ পর্যন্ত এই সব র‍্যাডিকেল পন্থীদেরকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ডিগবাজী খাইয়ে দেয়।

তবুও ১৯৭৭ সালের জাতীয় সম্মেলনে প্রকাশ দেবেন চক্র নেতৃত্বের ভাগীদার হওয়ার উচ্চাভিলাষে তাদের হীন মুখোস উন্মোচন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের পক্ষে নেতৃস্থানীয় সদস্য অশোকের বাস্তব পরিস্থিতির উপর যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনামূলক ঝাঁজালো অভিভাষণে এই চক্রটি কিস্তিমাত হয়ে যায়। কিন্তু সুবিধাবাদী উচ্চাভিলাষী হোতাদের মনের তুষে তখন থেকে পুরো অগ্নিসংযোগ ঘটে যায়। একদিকে রাজনৈতিক উৎপ্রাসন অন্যদিকে সামরিক ব্যর্থতার গ্লানি বৈপ্লবিক কাজে তাদেরকে পাশ্বমুখ করে তোলে। শুরু হয় উপদলীয় চক্রান্তের আনুষ্ঠানিক পাঁয়তারা বৃদ্ধি পায় ছিদ্রান্বেষ সন্ধান ও পরস্পরের বিরুদ্ধে কাঁদা ছুড়োছুড়ি। শেষ পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের গতিপথে ক্রমাগত উদ্যোগশক্তির ভাটা পড়ে লক্ষণীয়ভাবে।

১৯৮০ সালের ২২শে জানুয়ারী সমিতির সব চাইতে তুখোড় বিপ্লবী সন্তু লারমা যিনি ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রাণ স্বরূপ, তিনি বন্দীদশা থেকে বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করেন। তাঁর বীরোচিত সাহায্য ও উদ্যমের ফলে পার্টির নিভু নিভু প্রদীপে যেন তৈল ও সলিতা যোগ হয়। সমস্ত পার্টির কন্দরে কন্দরে নতুন করে প্রাণের শিহরণ শুরু

হতে থাকে, যার ফলে নতুন কর্মশক্তিতে পার্টি আরো গতিময় ও সচল হয়ে উঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু বাধ সাধলো ঐ নির্কমা, দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতা লোভী বিভেদপন্থীদল যারা তাঁকে ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজনৈতিক পক্ষে বলাৎকার করে উৎক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিল এবং সমগ্র পার্টিতে অন্তহানি ঘটাতে আদা জল খেয়ে পড়েছিল।

তাদের অবস্থা দেখে পার্টি নেতৃত্ব অচিরাৎ এক বৈঠকে বসে যাতে সমগ্র পার্টিতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদার করা যায়। পার্টির সর্বস্তরে এই প্রক্রিয়া শুরু হলে ক্রমেই এক প্রাণবন্ত কর্মপ্রয়াস দেখা দেয়; কিন্তু নিয়োগহীন আড্ডাবাজের দল, যাদের পেটে বোম ফাটালেও কোন শুভ ফলের আশা করা যায়না, তারা রাসভনিন্দিত হয়ে আড়কাঠির মত এক পার্শ্বে স্তুপীকৃত হতে থাকে। তারা ধেড়ে ছুঁচোর মতই পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক ন্যাকামি করতে সচেষ্ট হয়ে উঠে এবং তাদেরই মধ্যে গড়ে উঠে অস্পৃশ্যতা, আমড়াগাছিভাব আর শুরু হয় সুবিধাভোগীদের সমাবেশ। ক্রমেই নিষ্ক্রিয় অথচ উচ্চাকাঙ্খার ক্ষমতার মদমত্ত হয়ে উঠতে থাকে এবং ষড়যন্ত্রের কুণ্ডলী পাকাতে, উচ্চাকাঙ্খীদের আরতি গাইতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে এক পর্যায়ে রাখি শপথে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে পড়ে। চক্রান্তের পাঁয়তারা করতে একদিন দুর্নীতিবাজ পলাশ রথও দেখবে কলাও বেচবে এ প্রত্যাশায় চিকিৎসার অছিলা নিয়ে কেটে পড়ে। তখন উচ্চাভিলাষী ও প্রেমলীলায় উন্মত্ত গিরির অবস্থা ধরি মাছ না ছুঁই পানি। তিন দফা একান্ত আলাপে উভয়ে (পলাশ ও গিরি) চক্রান্তের পথে একাত্ম হয়ে পড়ে। এমনিভাবেই রাজনৈতিক সুবিধাবাদী চক্রের উচ্চভিলাষ চরম শিখরে পৌঁছে যায়।

১৯৮২ সাল। জাতীয় সম্মেলনের পূর্বাহ্ণ। রাজনৈতিক ও সামরিক ষড়যন্ত্রের নায়কধারী পৌরাণিক বেশে কোন তুরুপ প্রকাশ দেখেন, পলাশ রাজভাবী ভঙ্গিমায় যথারীতি উপবিষ্ট হয় সম্মেলনে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে অপ্রত্যাশিতভাবে পলাশ উদ্ধত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, পার্টি দলীয় নীতি, আদর্শ ও কৌশলের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তার এই আবেগময়ী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষণ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত [illegible] এবং পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিটি সদস্যের মনে তখন রাজনৈতিক প্রশ্ন শুরু হয়ে যায়। তাদের সেই ক্ষমতা দখলের জালিয়াতি এক পর্যায়ে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে এসে ঠেকে যেন একটুখানি 'ফুঁ' দিলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে প্রলয়ঙ্করী লেলিহান শিখা। তখন সুদক্ষ কাণ্ডারী দলীয়নেতা এম, এন, লারমার এক কঠিনতম অগ্নি পরীক্ষা। তিনি খুবই শান্ত, ধীর ও গঠনমূলক অথচ অতীব যুক্তিযুক্ত অভিভাষণে বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে গোটা পার্টি ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের উপর ঐতিহাসিক রূপরেখা শোনালেন। তাঁর এই ভাষণ এতই জোড়ালো ও যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, তাতে জোঁকের মুখে পড়ল ছাই আর গুমোট বাঁধা নিদাঘ হলো শীতল বারি বর্ষণ। বিভেদপন্থীর হোতারা বিচলিত হয়ে পড়লেও সে যাত্রায় নিজেদের আগুনে ছাই চাপা দিতে বাধ্য হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কেরামতকারী মহারথী প্রকাশ সদর্পে ঘোষণা করল যে দলীয় কোন নীতি আদর্শই তারা মানেনা। নিপীড়িত জাতিগুলোর এক জোট হয়ে সংগ্রাম করে টিকে থাকার নীতি কৌশলকে তারা চুলোয় দেয়। তারা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের নীতির সরাসরি বিরোধী। তারা দ্রুত নিষ্পত্তি নীতির বিশ্বাসী। এই ভাবে এই র‍্যাডিকেল পন্থীরা অসহিষ্ণু হয়ে ইতিহাসের চাকাকে উল্টোদিকে ঘোরাবার চেষ্টায় ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে নাম দিল 'বাদী' (দ্রুত নিষ্পত্তি পন্থী) পার্টির নাম দিল 'লাম্বা' (দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে বিশ্বাসী)।

কিন্তু এই টুকুই সব নয়। তারা পচা শামুক হয়ে পা কাটতে শুরু করল। আবেগ জড়িত হয়ে শুধু সংগ্রামকে বর্জন করল তাই নয় উপরন্তু সংগ্রামের পরিবর্তে আনলো—প্রতিক্রিয়া, মুক্তির বদলে দাসত্ব আর ঐক্যের বদলে আনলো বিভেদ; সর্বোপরি সৃষ্টি করলো সংগ্রামী ইতিহাসে জঘন্যতম ও কলঙ্কময় ইতিহাস।

বিভেদপন্থীদের এই উচ্চাভিলাষিতা—এই দৌরাত্ম আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কুণ্ডলীতে অতি সহজেই জড়িয়ে পড়ে। দেশী বিদেশী গুপ্তচর ও চক্রান্তকারীরা—যারা তিলকে তাল করতে সিদ্ধ হস্ত, তারা কাস মামা সেজে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকে। তারা ঐ তীর্থের কাক গিরি ও প্রকাশকে কেউকেটা বানিয়ে পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নেপথ্যে প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ঘোলাজলে মাছ ধরার জন্য অপকৌশল অবলম্বন করে। অনেকেই তথাকথিত "স্বতন্ত্র রাজ্য" প্রতিষ্ঠার রঙ্গুকর দিবাস্বপ্ন ও দেখতে থাকে। ঐসব উনপাঁজুরে বরাখুরের দল, যাদের গর্জন নেই গর্জনই সার,—কি বলিহারী! নিজেদের দাবী করতো লাল পুরুষ অথচ গভীর ডোবের না নির্লজ্জ পোড়ারমুখো— যাদের কুড়োর ছালও নেই, তাদের আবার রাধা নাম। বড্ডো হাস্যপদ!

দেশীবিদেশী এসব গুপ্তচর ও চক্রান্তকারীদের উদ্ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে আর যাই হোক পার্টির অভ্যন্তরে তা দাবানলের মত তড়িৎবেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিভেদপন্থীরা নিজেদের শক্তির ব্যাপ্তি ঘটাতে সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে বিষাক্ত হাওয়া ছড়িয়ে দেয়। জাতির ভাগ্যাকাশে তখন প্রচণ্ড মেঘের ঘনঘটা যেখানে ঘর্ষণে ঘর্ষণে বিদ্যুতের আভা দেখা যাচ্ছিল। সেই আসন্ন তাণ্ডবতাকে দেখে পার্টির কর্মীগোষ্ঠী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক পক্ষ জাতির জন্য, নীতি আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তারা নিষ্ঠাবান ও সৎ এবং অকুতোভয়ে তারা ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এল কিন্তু যারা ভবিষ্যদ্বাদী 'আগে খায় গোড় গনে না' তারা বিভেদপন্থীদের

আপাতরম্য শূন্যগর্ভ কথাবার্তায় বিশ্বাস করলো, চোরে চোরে মাসতুত ভাই হয়ে পার্টির বিপক্ষে গেল এবং শুরু করল লাগামহীন প্রতিক্রিয়া। তৃতীয় দলভুক্ত হলো তারাই যারা দুর্বল মানসিকতার অধিকারী, দোদুল্যমান চিত্ত যাদের সর্বশেষ পরিণতি হলো—হয় নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন, নয়তো বা মুখ্য শত্রুর কাছে আত্মসমর্পন করে গাঁ-বাগানোর ঘৃন্য ভূমিকায়।

বিভেদপন্থীদের ঘৃন্য প্রতিক্রিয়ার ফলে এক বিশ্রী নিকৃষ্টতম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সমগ্র পার্টিতে তখন এক অস্বস্তিকর অচলাবস্থা। এই অচলাবস্থা কেটে উঠার জন্য তীব্র সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। খাদ্য নেই, অর্থ নেই—কিন্তু আছে সীমাহীন ধৈর্য্য ও অটুট মনোবল। কুট নৈতিক চাপ—নেই সাহায্য—আছে আত্মনির্ভরশীলতার দৃঢ় প্রত্যয়।

দুর্নিবার পরিস্থিতি হিতাকাঙ্খীদের মনে বেড়ে যায় সংশয়। চার কুচক্রী ও শত্রু বাংলাদেশ সরকারের মনে তখন উল্লাস। যে হতভাগা জাতি বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে তাকে সাহায্য করার জন্য শক্তি যোগা-বার জন্য বিশ্বব্যাপী যারা প্রবল যোগাত্মিল তারা হতবাক হয়ে পড়ে। মুমূর্ষু একটা জাতির মধ্যে এই গৃহযুদ্ধ যা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার সামিল, তাতে সারা বিশ্বের মানবতাবাদী সহানুভূতিশীল বন্ধুরা দুঃখ প্রকাশ করলো। ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ চরমে গিয়ে পৌঁছলো। শেষপর্যন্ত বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের পায়ের ভিত টলটলায়মান হয়ে উঠলে তারা সমঝোতার আবেদন জানালো। আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে পার্টি শেষপর্যন্ত বিভেদপন্থী গিরি—প্রকাশ—দেবেন—পলাশ চক্রের আবেদনে সাড়া দিয়ে ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির ভিত্তিতে সমঝোতায় আসতে রাজী হলো। এই ভিত্তিতে দেশী-বিদেশী অনেক হিতাকাঙ্খীদের সহযোগীতায় ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বিভেদপন্থীদের সাথে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক বসে। বৈঠকে আশানুরূপ সমঝোতাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ জগতে চোরেরা যেমন কোনদিন ধর্মের কাহিনী শোনে না, তেমনি বিভেদপন্থীরা ও মানলো না এই সমঝোতা চুক্তি। তারা পার্টির অপ্রস্তুতি অবস্থাতে সেদিন তস্করের মত ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইংরেজী জাতির একমাত্র পথ প্রদর্শক কর্ণধার মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করলো অতি জঘন্য ও বিশ্রী নৃশংসতায়। নরাধমদের এই জঘন্যতম কাণ্ড দেখে সারা বিশ্ব হতবাক ও বিমূঢ় হয়ে যায়।

এই ঘটনায় গর্জে উঠে ক্ষুব্ধ জনতা, ধিক্কার দেয় সেই নরাধমদের। পার্টি কর্মী ও শসস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও বিক্ষত ব্যাঘ্রের মতই প্রত্যয় নিয়ে উঠে আর হয়ে উঠে ক্ষমাহীন। পার্টি ও জনগণ আবারো একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন প্রতিঘাত দিতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠে।

কিন্তু বিভেদপন্থীরা নাচ কোঁদার সময়ে চিরাচরিত ধাতে স্বদেশে-বিদেশে ক্ষুদ্র জনগণের একটা সামান্য অংশ চার কুচক্রীর আপাত মধুর বক্তব্যে বিমোহিত হয়েছিল। চক্রান্তকারীরা অহোরাত্র যখন অধিক শক্তিশালীর ভান করত, তখন শক্তির পুজারী জনগণের একাংশ তাদের সেই অন্তসার শুন্য ধাপ্পাবাজী মতবাদকে সমর্থন করেছিল। অবশ্য জনগণের একটা বৃহৎ অংশ পার্টি নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বরাবরই বিভেদপন্থীদের সমালোচনা করত। আর ঘোমটার মধ্যে খেমটার নাচ দিত, তারা পার্টির এই দুর্বলতার সুযোগ হতাশাবাদ প্রচার করতে থাকে। বৃহত্তম নিরপেক্ষ অংশটি ও তখন হতাশা নিরাশার মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে যে সমস্ত অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত এলাকায় জনগণকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে বলা যায় জনগণের বৃহত্তম অংশটি এই গৃহ যুদ্ধে নিরপেক্ষতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেছিল।

নির্মম এই গৃহযুদ্ধে শান্তিবাহিনীর ভূমিকা ছিল অপরিমেয় গুরুত্ব-পূর্ণ। নিঃস্ব জাতির কাছে যারা রতন, তাদের রতন চিনতে ভুল হয় না। তাই তাদের আস্থাভাজন ছিল নিষ্কলুষ, সংগ্রামী দৃঢ়তায় ছিল অটল। পার্টির সম্মুখে দুর্ভেদ্য যে বাধা তা দূরীভূত করতে এই সশস্ত্র বাহিনীই হয়েছিল অগ্রগামী। তারাই অগ্রপথিক—যারা শত্রুর মস্তককে চুরমার করে দিয়েছে, দিয়েছে পিশাচের মুখে পদাঘাত। তারাই ১৪ই জুনের ঘটনায় উদঘাটন করে দিয়েছে ষড়যন্ত্রের মশিলার আসল। কি করে নি এই বাহিনী? অহোরাত্র পরিশ্রম করে ঘর্মাক্ত দেহে, অভুক্ত পেটে হাতিয়ার আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়েছে। অন্ন নেই শুধু ঢেঁকিশাক, কাঁচা কলা আর কাঁঠাল ইত্যাদি খেয়ে তারা এক দিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অপর দিকে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তারা তোয়াক্কা করেনি শত্রুর ভর্ৎসনা, পরোয়া করেনি শত্রুর আক্রমণ। তাদেরই আত্মত্যাগে রঞ্জিত হয়েছে এই জন্মভূমি— শহীদদের সসম্মানে দাফন করেছে, আহতকে শুশ্রূষা করেছে। আহত যোদ্ধারা একটুখানি উপশম পেয়ে আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে দুর্বার বেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই সাথে পালন করেছে তারা। জল্লাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসে আর মজলুমের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্তে জাতির সম্মুখে তারাই বীর শ্রেষ্ঠ।

এই ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় একটা জাতির ইতিহাসে শান্তি বাহিনীই প্রথম দেখালো একই সাথে দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার দৃষ্টান্ত। দেখালো বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জ্বলন্ত উদাহরণ। তারা এমন একটা সশস্ত্র বাহিনী যারা নৈতিক মনোবলে বলীয়ান, কৌশলী ও বিচক্ষণ। যাদের মস্তকেই শোভা পায় গৃহ যুদ্ধের সেই রক্তিম বিজয় মুকুট। তারা শত্রুর চোখে যেমনি যম তেমনি বন্ধুর চোখে করুণার আলো। এই গৃহযুদ্ধে

এক রক্তাক্ত নদী পার হয়ে কি পেয়েছে তারা? অর্থ সম্পদ, মান? না, তারা সেসব কিছুই পায়নি। পেয়েছে শুধু পার্টির নৈতিক শিক্ষা আর পেয়েছে নিপীড়িত জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসা।

দলের অভ্যন্তরে মত বিরোধ যখন চরমে পৌঁছে যায় তখন শত্রু বাংলাদেশ সরকারের কত না উল্লাস? কেননা পার্টির সর্বনাশ হওয়া মানে তাদেরই পৌষ মাস হওয়া। অতএব তারাও ঝোপ বুঝে কোপ মারতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ছিল হরেক রকম আজগুবি কথা রটিয়ে পার্টি ও নেতৃত্বের ভাবমূর্তি নষ্ট করে জুম্ম জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। পরে আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে মনগড়া ও বানোয়াট খবর পরিবেশন করে একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেবার কাজে পরিনিবৃত্ত হয়ে পড়ে। তারপর জিয়া সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামরিক প্রেসিডেন্ট এরশাদ রাঙ্গামাটির প্রকাশ্য জন সভায় ৩রা অক্টোবর '৮৩তে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে আত্মসমর্পন করার আহ্বান রাখে। উদ্দেশ্য, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে পশ্চাৎভাগে ছুরিকাঘাত করা। যেন রক্ষক সেজে ভক্ষক হবার মহাপরিকল্পনা। অথচ দু'পক্ষের সংঘর্ষ যখন চরমে উঠে তখন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এক দিকে সাবাড়ুওলীর মত পিছন থেকে পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে আর অপরদিকে নাগিক জুম্ম জনগণের উপর চরম নির্যাতন নিপীড়ন ও অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার বিভেদপন্থী চক্রদের সাথে মামা ভাগ্নের এক গোপন আঁতাত করে একদিকে গৃহযুদ্ধ প্রলম্বিত করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চিরতরে নস্যাৎ করে দেবার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়; অপরদিকে জাতীয় দুলা (প্রতিক্রিয়াশীল দালাল)দের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে।

এই যে গৃহযুদ্ধ যা একটা রক্তাক্ত নাটক, পৃথিবী ব্যাপী যার ব্যাপ্তি সেখানে গণধিকৃত দুলা (প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী দালাল) গোষ্ঠীর ভূমিকা কি ছিল সেটাও একটা বিবেচ্য বিষয় নয় কি? এত দিন কালভার্টীয় নেতারা যে গর্তের মধ্যে সুপ্ত ছিল সেখান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে। কথায় বলে কুকুরের সামনে লোভনীয় মাংস খণ্ড রাখলে খেতে পাক বা না পাক লেজটা অন্ততঃ নাড়তে বাধ্য। তাইতো দেখা গেছে দেশী বিদেশী দুলাদের কত লম্ফ ঝম্প। আহম্মকেরা আর বুঝতেই চায়না—কত হাতী ঘোড়া গেছে তল, ভেড়ায় বলে কত জল?

যেহেতু চোরের স্বভাব গাঁট কাটা। অতএব দুলা গোষ্ঠীও সুযোগ বুঝে ধুমল দিতে শুরু করে। বোধ করি তারা ভেবেছিল গৃহযুদ্ধের মহাতাণ্ডবে সমস্ত গাছপালা উজার হয়ে যাবে সেখানে এরেণ্ডাগুলোই তো হবে প্রধান! অতএব শুরু হয় মোসাহেবীদের মুনশিয়ানা। তারা পরের ধনে পোদ্দারী করতে হারামী সংবাদপত্র 'বনভূমি ও গিরি দর্পন'কেই মুখপত্র করে নেয়। তখন অপপ্রচারের সে কি বাহার! আদা বেপারীরও কত জাহাজের খবর— অমুক যুদ্ধে অমুক নেতার পগারপার— অমুক তারিখে শতজনের মৃত্যু। বর্তমান নেতা সন্তু লারমার পলায়ন অথবা মৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদি— ঐ নির্লজ্জদের মুখে ছাই পড়ুক। আসলে কোন খুঁটির জোরে কোন ছাগল নাচে, সাধারণ মানুষের তা কখনও অজানা ছিলনা। তা সত্বেও ঐ নির্লজ্জ পোড়ার মুখোরা তাদের ভগ্নিপতির লেজ ধরে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার হালুয়া রুটীর রাজনীতিতে শরীক হতে থাকে। কিন্তু এসবে আর কি হবে? শত দামী হলেও রঙিন চশমা দিয়ে পৃথিবীর আসল চেহারাটা চেনা কখনো কি সম্ভব?

তবুও ফেরেশতার আলখেল্লা পরে মুহুরী সাজতে চায় তারা; শুরু হলো আত্মসমর্পন করিয়ে দেবার আদম ব্যাবসায়ের প্রতিযোগিতা। এক সময় সেয়ানা গিরির চরম মুহূর্তে পৌঁছে হোমরা চোমরা সেজে কত সাংবাদিকের সামনে সাক্ষাৎকার দিতে থাকে; কত মন্তব্য তাদের। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাদেরকে জনগণও বলি না। তারা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী স্রেফ 'দুলা গোষ্ঠী' আর নেহায়েত যদি যুক্তিতর্ক নিয়ে পীড়াপীড়ি করে তাহলে ভাগ্যচক্রে সহানুভূতি জন্মালেও তখন হয়তো বলবো 'কলুর বলদ।'

অবাঞ্ছিত এই গৃহযুদ্ধ প্রতিনিয়ত ন্যায় অন্যায়ের পথ খুঁজে নিতে থাকে। আজ কেউ যদি বিভেদপন্থীদের প্রশ্ন করেন—কেন জাতির অগ্রনায়ক পার্টি প্রতিষ্ঠাতাকে হত্যা করেছ? জাতির ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে দিয়েছে? কোন নিরীহ মানুষের বুকে নির্মমভাবে গুলি চালিয়েছো? একশত বিভেদপন্থীদের মধ্যেও কেউ কি এর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে? কিন্তু এইটুকুই জানে যে, তারা অন্যায় করেছে। তবুও সেই অন্যায়কে স্বীকার করার হিম্মত কি কারোর আছে? তাদের সেই অন্যায় কাজ তাদেরই প্রয়োজনকে ত্বরান্বিত করেছে। যুগে যুগে অন্যায়কারীরা পরাজিত হয়েছে এবং বাধ্য হয়েছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। বিভেদপন্থীদের এই প্রায়শ্চিত্তের ফল ৪নং সেক্টরের চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং প্রতিটি লড়াইয়ে ঘটেছে চূড়ান্ত পরাজয়। এইসব পরাজয়ের চূড়ান্ত বিন্দুতে এসে অবশেষে ২১শে জানুয়ারী ১৯৮৫ ইংরেজী চরম হতাশা সন্ত্রস্ত হৃদয়, পরাজয়ের গ্লানি আর উচ্ছ্বসিত কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে গোলক প্রতিমায় বিভেদপন্থীদের শক্তি মৃন্ময় পাত্রের মতই চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

যে বিভেদপন্থীরা পার্টিকে আপোষপন্থী বলে নিন্দা করতো, যারা নিজেদের দাবী করতো নিখাঁদ দেশপ্রেমিক বলে, সেই বিভেদপন্থীরা পরিনামে ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং তারিখে রাঙ্গামাটির স্টেডিয়ামে শত শত জনতার সামনে অতি নির্লজ্জভাবে শত্রুর কাছে সশস্ত্রভাবে আত্ম-

সমর্পণ করে। সেদিনই পদদলিত হয়েছিল তাদের সেই মিথ্যা দেশপ্রেম, বানপ্রস্থে গিয়েছিল তাদের সেই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি। তারা আজ গণধিকৃত ও নিন্দিত কারণ তারা পাপী, তারা অসুর, তারা বিকারগ্রস্ত মানুষের অপচ্ছায়া। জনগণ এখন তাদেরকে মরা কুকুরের মতই ব্যবহার করেন। তারা এখন বাংলাদেশ সরকারের রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, কাপ্তাই, খাগড়াছড়ি ও মানিকছড়ির ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষিত মনোহর মিউজিয়ামে অবস্থান করছে।

বিভেদপন্থীদের দ্বিতীয় অংশটি যারা এখনও জনদরদী, যাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির সৎসাহস আছে তারা সচেতন হয়ে গত ২৬ ও ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং তারিখে পার্টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। প্রয়াত নেতার প্রদর্শিত ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ—এই তিনগুণের ভিত্তিতে পার্টি তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছে এবং আত্মউপলব্ধির সুযোগ দিয়েছে। জনগণও তাদেরকে গঠনমূলক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছে কিন্তু সহজ ভাষায় রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করে—এবার কি নাম রেখেছো ?

এ ছাড়া অবশিষ্টাংশ, গৃহযুদ্ধের তথাকথিত প্রতিভাধর নায়ক গিরি—প্রকাশ—পলাশের নেতৃত্বে অনন্যোপায় হয়ে নিদেনকালে হরিনাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে ৩১শে এপ্রিল, ১৯৮৭ আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টির নিকট তারা নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করে মূলতঃ আত্মসমর্পণ করেছে। জনগণের ভাষায় তারা এখন বন্ধ্যা, যাদের মাথা দেওয়ালে ঠেকেছে।

অতি তিক্ত অনাকাঙ্খিত গৃহযুদ্ধের শুভ অবসান ঘটেছে বেশ কয়েকটি মাস আগে। গৃহযুদ্ধের কারণে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অপূরণীয়। তবুও ফলাফলে দেখা যায় নীতিগতভাবে পার্টি অনেক অনেক উপকৃত হয়েছে। যদিও জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, জাতির কর্ণধার ও পার্টি প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে চিরতরে হারিয়েছি; হারিয়েছি অনেক বিপ্লবী সাথীকে যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা, সাহস ও উদ্যোগ শক্তি আন্দোলনের গতিতে তীব্র বেগ সঞ্চার করতে পারতো। চার কুচক্রী ও শত্রুর বুলেটে হয়েছে অনেক শহীদ, প্রিয়জনের বিচ্ছেদে অনেকেই হয়েছেন শোকাহত অনেকেই শত্রুর কারাগারে দুঃসহ বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন—সর্বোপরি আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের গতিপথে শত শত মা-বোন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পাশবিক কামনার শিকারে পরিণত হয়েছেন। তথাপি দলের অভ্যন্তরে যে সুবিধাবাদ এতদিন বিরাজ করছিল—যার উৎপত্তি হয়েছিল স্বার্থপরতা, কুঁড়েমী হামবড়াভাব ও কষ্টতর কাজ করার অনীহা থেকে, তা এখন মূলচ্ছেদ হয়েছে। এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠী দলের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোই অধিকার করে থাকতো অথচ কার্যক্ষেত্রে ফাঁকি দিয়ে নিরুঞ্ঝাট ও আয়েশী জীবন কাটাতো। তারা অন্যকে যেমন অগ্রসর হতে দিতো না, বা বাধা প্রদান করতো এমনকি পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করতো অথচ তেমনি নিজেকে পয়লা নম্বরের পণ্ডিত ভাবত। না পড়েই পণ্ডিত হবার এরকম নীতির ধারক ও বাহক যারা, তারা আজ ঐ গৃহযুদ্ধের ফলে পার্টির সমস্ত অঙ্গ থেকে সমূলে উৎখাত হয়েছে।

সুবিধাবাদীদের যতই দৌরাত্ম্য থাকুক, যত থাকুক তাদের দুরভিসন্ধি, যেহেতু টিকে থাকার ভিত্তি নেই তাই তারা উচ্ছেদ হয়েছে এবং পার্টি তার নীতি আদর্শের স্ফুরণ ঘটাবার সুযোগ পেয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতা ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের নীতির ভিত্তিতে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে টিকে থাকার নীতিকে পার্টি কাজ করতে সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং দলীয় নীতি আদর্শের বিজয় অর্জিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা যারা জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের সংগ্রামকে বিরোধীতা করে এবং ছোট ছোট জাতিগুলোর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবার আশা পোষণ করে তারা আজ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যারা জুম্ম জাতির বেঁচে থাকার সংগ্রামকে বানচাল করে দিতে চায় কিংবা ঘোলাজলে মাছ ধরার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা ছিদ্রানুসন্ধানী হয়ে সুবিধাবাদীদের যেভাবে সুকৌশলে ব্যবহার করতো—সেই সুবিধাবাদীদের বিতাড়নের ফলে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

যেহেতু সুবিধাবাদ হচ্ছে একটা ক্ষয়কারক এবং সংগ্রামকে বর্জন করে, সেহেতু দলের অভ্যন্তরে এই সুবিধাবাদীদের উপস্থিতিতে পার্টির কর্মক্ষমতা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। এই অশুভ শক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা নিজে যেমন এগিয়ে যেতে অক্ষম তেমনি অপরকেও বাধা প্রদান করে। এই শক্তি দূরীভূত হওয়াতে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব হ্রাস পেয়েছে এবং দলীয় কর্মশক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। দলের মধ্যে যারা সবচাইতে কর্মক্ষম ও সংগ্রামী তারা বিনাবাধায় কাজ করার সুযোগ পাওয়াতে দলের শক্তি বরং কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু শত্রুবাহিনী তথা বাংলাদেশ সরকারও একদিকে যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে নতুন করে ভাবনা ভাবতে শুরু করেছে। শত্রু চায় দমন নীতির ভিত্তিতে জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করতে আর জুম্ম জাতি চায় সংগ্রামের মাধ্যমে টিকে থাকতে। তাই শত্রুরা চায় জুম্ম জাতির সংগ্রামী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল 'ভাগ করা ও শাসন করার' নীতিকে কার্যকরী করতে কিন্তু দল থেকে বিভেদপন্থীরা—বিতাড়িত হওয়াতে শত্রু সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে অধিকন্তু পার্টি ঝঞ্ঝাটমুক্ত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এসব কিছু আঁচ অনুমান করে বর্তমানে শত্রু বাংলাদেশ সরকার নতুন নতুন ফন্দি আটবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব কিছু লক্ষ্য করে দেশী-বিদেশী গুপ্তচরেরাও খুব সাবধান

হয়ে পড়েছে। যেভাবে রক্তক্ষয়ী নির্মম গৃহযুদ্ধ অবসান করে পার্টি দ্রুত কর্মশক্তিতে এগিয়ে চলেছে এবং বিগত গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পার্টি গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে দেশী-বিদেশী গুপ্তচরেরা সাবধানতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

এদিকে বিভেদপন্থী সমর্থকেরা ও বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছে বিভেদপন্থীদের হীন কার্যকলাপ ও উদ্দেশ্য যা আদতে ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও আত্মঘাতীমূলক। তাই তারা ক্রমেই উপলব্ধি করছে যে, জুম্ম জাতিকে টিকে থাকতে হলে শুধু কথার ফুলঝুরিতে নয় কিংবা শ্লোগানের ধাক্কায় নয়—বাস্তবসম্মত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রদর্শিত নীতি আদর্শই সবচাইতে বাস্তবসম্মত, যুগোপযোগী ও যুক্তিযুক্ত বলে আজ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে।

তা সত্ত্বেও কিন্তু বিভেদপন্থী হোতাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমূল্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যাওয়া। এদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। তারা নিজের নাক কেটে হলেও অপরের যাত্রা ভঙ্গ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ। প্রয়োজনে নতজানু হতে দ্বিধা করে না—আবার সুযোগে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে ও ওস্তাদ। তাই কখনও "যাকে আল্লা মারে কে" আবার কখনও "রাখে হরি মারে কে"—এইসব সুবিধাবাদী পন্থায় চার কুচক্রীরা নিমগ্ন রয়েছে। তাদের চেহারা দেখতে ঠিক মৃত বানরের মত হলেও এখনও একদিকে সরকারের দালালী ও লেজুর বৃত্তি করেছে, অন্যদিকে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের হীন ব্যক্তি স্বার্থের কারণে তারা অতীতে যেমন ষড়যন্ত্র করেছিল, বর্তমানেও করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে। তাদের এই চরিত্র মজ্জাগত। অবশ্য এই গোলনটি উন্মোচিত হয়ে পড়লে তারাও বিদেশের চিড়িয়াখানায় অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্গারুর মত প্রদর্শন যোগ্য হয়ে পড়বে।

যে কোন সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পিছনে কোন ধরণের মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে— এই তত্ত্ব আবিষ্কার করতে না শেখা পর্যন্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে চিরদিন প্রতারণা ও আত্ম প্রতারণার নির্বোধ বলি হতে হয় এবং চিরকাল তাই হতে হবে। জুম্ম সমাজের যাবতীয় ভণ্ডামী, প্রতারণাও শোষণ টিকে আছে কোন কোন শাসক শ্রেণীর শক্তি জোরে তা অবশ্যই বুঝতে হবে। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর প্রতিরোধ চূর্ণ করার শুধু একটিই মাত্র উপায় আছে— তা হচ্ছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নীতি ও আদর্শ। এই নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম করা এবং সংগ্রাম করার জন্য নিজেদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা। এই নীতি থেকে প্রতিটি বিচ্যুতি যে কি মারাত্মক ভুল ও ক্ষতিকর— তা গৃহযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ বার বার প্রমাণ করে দিয়েছে।

এই মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজ আর আমাদের মাঝে নেই কিন্তু আছে তাঁর নীতি ও আদর্শ— আছে তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী— যাঁরা আন্দোলনকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর। সেই নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পার্টি আজ শূন্য থেকে গড়ে উঠে বিরাট এক সংগ্রামী শক্তি নিয়ে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। যে নীতি আদর্শ জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে, বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে এবং নির্যাতিত জাতিগুলোর এক জোট হয়ে সংগ্রাম করার পথ দেখিয়েছে—মহান নেতার সেই নীতি আদর্শের ভিত্তিতেই আন্দোলন এগিয়ে যাবে।

জুম্ম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মতবাদের মহান গুরু যে শিক্ষাদান করেছিলেন তারই প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত অনুবর্তন হিসেবে বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্রিয় বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পার্টির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে তিনি নতুন হলেও পরিচয়ের দিক থেকে নেতা হিসেবে এবং অভিজ্ঞতায় তিনি অনেক পুরোনো। প্রয়াত নেতার জীবদ্দশায় তিনি দীর্ঘদিন দোহারের কাজ করেছেন— কাজেই দুই নেতার জীবন সাধনা হয়ে উঠেছিল সাধারণ ও পারস্পরিক। জনগণের ভাষায়—"দুই সহোদরের মধ্যে বড় ভাইটি হচ্ছেন সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী আর ছোট ভাইটি হচ্ছেন 'ইমারত শিল্পী'।" বস্তুতঃ পক্ষে পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রথমার্ধে সংগঠনের মাধ্যমে যিনি জনগণের প্রকৃত লৌহ প্রাকার গড়ে ছিলেন এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যাপী গেরিলা ঘাঁটি এলাকা ও পার্টির অঙ্গসংগঠন সমূহ প্রতিষ্ঠা ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যিনি সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার তিনি হচ্ছেন বর্তমান নেতা সন্তু লারমা। একমাত্র তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শান্তিবাহিনী জন্মলাভ করে দ্রুত গতিতে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। একথা অত্যন্ত বাস্তব সত্য যে ছাত্র জীবন থেকে যাঁর রাজনৈতিক অঙ্গনে হাতে খড়ি— তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল— মধু থেকে মাইনি, কাচলং, সন্তা দুরুং হয়ে ফেণী, লোগাং পুজগাং পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আপামর জুম্ম জনগণের দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ভিন্ন ভাষাভাষি দশটি জুম্ম জাতির নেতা ও দুঃখী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। বিভিন্ন দেশ ঘুরে এক দিকে গগনচুম্বী অট্টালিকায় বসবাস করার ও অন্যদিকে গৃহহীন নিঃস্ব মানুষের ভীড়ে অবস্থান করার বিচিত্র অভিজ্ঞতা একমাত্র তারই হয়েছে। সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনের অভাব অনটন থেকে শুরু করে শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করার যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। তিনিই সেই একনিষ্ঠ বিপ্লবী সন্তু লারমা যিনি ১০ই নভেম্বর সবচাইতে বেদনাদায়ক ও হতাশা ব্যঞ্জক দিনেও সুমেরুর মত অটল থেকে পার্টিকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়ে গৃহযুদ্ধের বিজয় মুকুট ছিনিয়ে এনেছেন। জটিল গৃহযুদ্ধের সময়েও তিনি যে সমস্ত সাহসী ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে সবের সব্বই শতাংশই সাফল্যজনকভাবে কার্যকরী হওয়াতে তিনি শতকরা একশো ভাগ ভোট পেয়ে পার্টিতে নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এবং সমগ্র পার্টিকে নতুন করে নিবিড় ও কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ করেছেন— তারই নেতৃত্বে পার্টি গতিশীল না হয়ে পারে না।

যে বুনিয়াদের উপর বিভেদপন্থী শক্তি দাঁড়িয়েছিল তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়াছে সত্য কিন্তু বিভেদপন্থীদের কালোহাত ও বিষদাঁত এখনও পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়নি। তারা এখনও সর্ব্বশেষ মরন কামড় দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং যাবেই। এ যাবৎ এদের জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়েছে কিন্তু আর নয় খেসারত— উন্নতমানের বৈপ্লবিক সচেতনতা ও দুর্বার সংগ্রামী শক্তি নিয়ে বিভেদপন্থীদের এই সর্ব্বশেষ তৎপরতা ধ্বংশ করে দিতে প্রতিটি কর্মীর আরো সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

এই সেই গৃহযুদ্ধ— যা কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার মতই জঘন্য ও বর্ব্বর রূপ নিয়েছে— তা সবার কাছে সব চাইতে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা। "বিলুপ্ত প্রায় এই জুম্ম জাতি— বাঁচাতে হবে এই জুম্ম জাতিকে— প্রতিষ্ঠা করতে হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ"— এই যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্যকে ভুলে গিয়ে কর্মীদের মধ্যেকার ছোটখাট মনোমালিন্য যা ছিল অবৈর তা ষড়যন্ত্রের জালে আবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বৈরী দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়াই ভায়ের বুকে ভাই গুলি চালিয়েছে এবং জাতীয় ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে— সে সব আজ সবার কাছে সব চাইতেই ঘৃণাই। অনেক রক্ত ঝড়েছে—আর নয় বৃথা রক্ত—আর নয় খেসারত— আর নয় বিভেদ তথা ষড়যন্ত্র—সেই অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধ—এই তিক্ত অভিজ্ঞতা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য হয়ে থাক বড় শিক্ষা। আর এই শিক্ষার আলোকে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন উজ্জীবিত হয়ে জুম্ম জনগণের বিজয় ত্বরান্বিত হউক।

স্মৃতি

— শ্রী মনোজ

তখন ১৯৫৩ সাল। গ্রামের পাঠশালা সমাপ্ত করে মহাপুরম জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হলাম প্রাইমারী সেকশানে। একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত একটি সরকারী রাস্তা চলে গেছে। বিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্বদিকে দিগন্ত প্রসারী ধানের ক্ষেত, দক্ষিণে খেলার মাঠ ও তিনদিকে নানা রকমের ফল-ফুলের বাগান। বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত মহাপুরম গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে ছোট্ট নদী মহাপুরম প্রবাহিত। নদীর নামানুসারে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে মহাপুরম।

বিদ্যালয়ের প্রশাসন ছিল আদর্শস্থানীয়। শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি ছাত্রই বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন কড়াকড়িভাবে মেনে চলতো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীচিত্তকিশোর চাকমা। এইরকম অভয়বান আদর্শ শিক্ষক হাজারেও একজন মিলে না। তিনি একজন সমাজ সেবক ও শিক্ষাবিদ। এই প্রধান শিক্ষকের স্থলীয় স্থানীয় হলেন শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (মঞ্জু)।

শ্রদ্ধেয় এম, এন, লারমা আমার থেকে বয়সে ও ক্লাশে ছিলেন বড়। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন অপ্রয়োজনীয় কথা সহজে বলতেন না। আমার জানা মতে পড়াশুনার প্রতি তাঁর বেশ একাগ্রতা ছিল। অন্যান্য ছাত্রদের মতন তিনি তেমন ঘুরাফিরা করতেন না। এই স্বল্পভাষী লোকটির অন্তরের ভিতর এত দেশপ্রেম এত জাতীয়তাবোধ যে লুকায়িত ছিল এবং কে জানতো, যে শেষ পর্যন্ত তিনিই পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান ও প্রথম জীবন্ত মূর্তি হয়ে উঠবেন। তিনি সং ও ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন। শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে গোটা ছাত্রসমাজে তিনি ছিলেন প্রিয় পাত্র। কারণ তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও সংযমী ছিলেন।

১৯৫৬ সালে তিনি মহাপুরম জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে রাঙ্গামাটির সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় একটি মাত্র সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে অনেকের পড়াশুনা করার ইচ্ছা থাকলেও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হতে হয়। তাও কিন্তু খুব কড়াকড়ির মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) তখনকার সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটাই ছিল সবচাইতে বড়।

আমিও ঠিক তাঁর চলে যাওয়ার একবছর বাদে মহাপুরম স্কুল থেকে রাংগামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। আমি থাকতাম দুই নম্বর হোষ্টেলে আর মানবেন্দ্র লারমা থাকতেন এক নম্বর হোষ্টেলে। সেখানে দেখেছি পড়াশুনায় তিনি একদম ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন; কাহারও সাথে ঝগড়া বিবাদ করতেও কোন দিন দেখিনি। কিন্তু কেউ যদি স্বজাতির নামে কোন অসম্মানজনক ও অবজ্ঞাসূচক কথা বলতো, তখন কিন্তু তিনি তার জোড়ালো প্রতিবাদ না করে থাকতেন না। এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনাই তাঁর ছাত্রজীবনে ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে নানা রাজনীতি আর দর্শনতত্ত্বের বই পড়তেন খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই তা জানতে পারে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে আর একজন ছাত্রের কথা উল্লেখ করছি; তাঁর নাম ছিল সুধাকর দীপা। তিনিও থাকতেন দুই নম্বর হোষ্টেলে; তাঁকেও দেখেছি নানা ধরণের রাজনীতির বই পড়তে। একদিন তো থানা থেকে পুলিশ এসে দস্যুর মতন তাঁর সব বইপত্র এবং ট্রাংক তল্লাসী করেছিল এবং তাঁকে শেষ পর্যন্ত থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়তাম তখন একদিন আমাকে বিকাল বেলায় বিদ্যালয়ের কম্পাউণ্ডে ডেকে নিলেন প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা; বললেন, "দেখো মনোজ, চলবেনা। এই ডিগ্রীর সার্টিফিকেট দিয়ে আমাদের কোন লাভ হবেনা। সরকারী চাকুরী করি আর বেসরকারী চাকুরী করি, আমাদের জুম্ম জাতির ভাগ্য কিছুতেই পরিবর্তন হবেনা। কাজেই আমাদের অন্যপথ ধরতে হবে। যেই পথের কথা বলছি—সে পথ কিন্তু বড়ই কঠিন আর বিপদ সংকুল। যেমন— দেখো মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষ বোস সূর্য্যসেন এর মতো অনেক মহাপুরুষ ও বিপ্লবীদের ঘটনাবলী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে"। আমি প্রয়াত নেতার এ ধরণের কথা যতই শুনছি ততই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে থাকে। তিনি আরও বলেন— "মহাপুরুষের জীবনী সুযোগ পেলে পড়ে নিও। পত্রপত্রিকা এবং ম্যাগাজিনও পড়তে হবে"। তিনিই প্রথম আমায় পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন পড়ার প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন।

প্রয়াত নেতা ১৯৫৮ সালে রাংগামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েও কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে আই, এ, ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে তিনি ঐ কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন। আবার তিনি একই কলেজে বি, এ ক্লাশে ভর্তি হন। থাকতেন পাথর ঘাটার পাহাড়ী ছাত্রাবাসে। তখন আমি পড়তাম স্যার আশুতোষ কলেজে আই, এ ক্লাশে। তখনও তিনি আমাকে মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য খবরাখবর দিতেন। স্যার আশুতোষ কলেজে পড়লেও আমি থাকতাম ত্রিপুর পাহাড়ী ছাত্রাবাসে। প্রায়

এলাকা হলেও শ্রীপুর বেশ সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিল।

তখন ১৯৬২ সাল। প্রয়াত নেতা তখন বি, এ ক্লাশের শেষ বর্ষের ছাত্র। আমাকে একখানা জরুরী চিঠি দিলেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। তখন তো সারা পাকিস্থানে সামরিক শাসন চলছে। ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। তখনতো কলেজে জুম্ম ছাত্র সংখ্যা একদম নগণ্য। প্রত্যেকটি জুম্ম ছাত্রের পিছনে টিকটিকি (ডি. আই. বি) লাগানো থাকতো। গেলাম চট্টগ্রামে। দেখা যখন হয়, তখন আমাকে বললেন, 'ভাই আমাদের একটা কাজ করতে হবে। দেখছনা কাপ্তাই বাঁধের ফলে আমাদের জুম্ম জনগণের ৫৪,০০০ একর জমি জলের তলায় ডুবে গেল, আর লক্ষাধিক লোক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসন না পেয়ে নানাদিক ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের উপর ভণ্ডামী আর জোচ্চুরী রাজনীতি শুরু করেছে। কাপ্তাই বাঁধের জল ৬০ ফুটের নীচে রাখা, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসনের দাবী জানিয়ে একটা লিফলেট জুম্ম জনগণের কাছে বিতরণ করি।" অবশ্য এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবি এবং চাকরীওয়ালা ছেলেদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবোনা বলে মন্তব্য করলেন। তুমি আজ শ্রীপুর ছাত্রাবাসে গিয়ে এ সম্পর্কে অবস্থা বুঝে আলোচনা করো। পরেরদিন সতীর্থদেরকে প্রয়াত নেতার কথাগুলো বললাম। তখন গ্রামের ছেলেরা প্রত্যেকেই প্রয়াত নেতার কথা সমর্থন করলো। শুধু চুপ করে রইলো ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিদের ছেলেরা। শুধু চুপ করে থাকলোনা—তারপর দিন থেকে কলেজের পড়াশুনা বাদ দিয়ে গোপনে স্ব স্ব বাড়ীতে চলে যেতে শুরু করলো। পাছে রাজনীতি করার অজুহাতে গ্রেপ্তার এবং নিজ নিজ অভিভাবকের মর্যাদাহানি হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা গাঁয়ের চাষা ভুষা ছেলেরাই শ্রীপুর পাহাড়ী ছাত্রাবাসে রয়ে গেলাম।

সম্ভবতঃ ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাস হবে। আমি ও পূর্ণমোহন চাকমা দুইজনে চট্টগ্রাম গেলাম নির্দিষ্ট তারিখে লিফলেটগুলো নিয়ে আসার জন্য। এম, এন, লারমার সাথে দেখা হলো এবং গোপনে প্রেস থেকে ছাপা কাগজগুলো নিয়ে আসলাম। আমরা সেই লিফলেটগুলি নিয়ে সোজা চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে গেলাম। গোমদণ্ডী রেল ষ্টেশন হয়ে চলে আসলাম সেদিন রাত্রে শ্রীপুর ছাত্রাবাসে। কিন্তু পরের দিন যোগাযোগ ছাড়াই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্ঞানেন্দু চাকমা ও প্রদ্যুৎ দেওয়ান সহ চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুর ছাত্রাবাসে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। আমরা তো একদম অবাক। শেষ পর্যন্ত আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম। জ্ঞানেন্দু চাকমা ও প্রদ্যোৎ দেওয়ান লিফলেটগুলি বিতরণ করার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ তাদের যুক্তি হলো ভাষাটা অত্যন্ত কড়া হয়েছে। এই লিফলেটগুলি বিলি হওয়ার সাথে সাথে আমরা সবাই গ্রেফতার হয়ে যাবো। শেষ পর্যন্ত কিছু শব্দের রদবদল করে আবার ঠিক হলো ছাপানো হবে। এই মর্মে সিদ্ধান্ত হলেও আমরা তেমন পরিবর্তন না করেই পুনরায় ছাপালাম। এবার লিফলেটগুলি বিতরণ করার পালা। কিভাবে বিতরণ করা হবে প্রয়াত নেতা সবই আগে ভাগে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। একদিন সকালে আমি ও মিহির শ্রীপুর থেকে সেই কাগজপত্র নিয়ে দু'টো সাইকেল দিয়ে রওনা দিলাম। প্রথমে চন্দ্রঘোনার দিকে। তখন চারু বিকাশ চাকমা (বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সংসদ সদস্য) ও সর্বদর্শী চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে চাকরী করতেন। দুইজনকে দু'টো আলাদা খামের ভিতর মানবেন্দ্র লারমার ব্যক্তিগত চিঠিসহ একটি করে লিফলেট বিতরণ করলাম। এরপর গেলাম কাপ্তাই। তখন সেখানকার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ছিলেন প্রভাত কুমার চাকমা। তাঁর নামের খামটি দিলাম। লিফলেট খানি পড়লেন এবং কয়েকটি স্থানের নীচে দাগ দিলেন। বললেন, পুত্‌-রুক (ছেলেরা) তোমরা এ সমস্ত কি কাজ করেছ? মন্তু (এম এন লারমা) তোমাদেরকে শেষ করবে। তোমারা এগুলি আর বিলি করোনা। কলেজে ফিরে যাও। এটা পাকিস্তান সরকারের কানেও গেছে। সরকার তোমাদের ছাড়বেনা—আমাদেরও চাকুরী থাকবেনা। অবশ্য তার সাথে এ ব্যাপারে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়ে যায়।

অনেক কষ্টে রাংগামাটিতে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে কাহারও বাড়ীতে না উঠে আনন্দ বিহারে (বৌদ্ধ মন্দির) উঠলাম। পথে যারা আমাদেরকে দেখেছে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখলো এতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি। আমরা রাঙ্গামাটি পৌঁছার আগেই বাড়ীতে বাড়ীতে প্রচারিত হয়ে গেছে যে, লিফলেট যারা বিলি করতে আসবে তাদেরকে অন্তত কেউই জায়গা দিবেনা। এই সূত্রে আমরা কারও বাড়ীতে না উঠে সেজন্য সোজা বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে উঠলাম। আমাদের একটাই সংকল্প যে কোন ভাবেই হোক আমাদের এই লিফলেটের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের ভণ্ডামী আর অন্যায়ের কথা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগনের কাছে পৌঁছে দেবো। এরপর বন্ধুবর অংকনের সাথে দেখা হয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললাম। বলার পরই তিনি সোজাসুজি তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন তাদের বাসায় আমাদের সমস্ত কাগজপত্র দিলাম। তারপরের দিন থেকে লিফলেট বিলি করতে শুরু করি।

এক সপ্তাহের মধ্যে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সহযোগিতায় এই কাজটি আমরা নিরাপদে সমাপ্ত করে শ্রীপুর ছাত্রাবাসে ফিরে গেলাম। শ্রীপুরে একদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে এম এন লারমার সাথে দেখা করতে গেলাম চট্টগ্রামে। তার বিছানায় বসলাম। আমরা কিভাবে বিলি করেছি, সুবিধা অসুবিধার কথা অবগত করতে শুরু করলাম। এমন সময় পূর্ণাঙ্গ বরন খীসা একজন দাড়িওয়ালা লোক নিয়ে ছাত্রাবাসে ঢুকে পরলো। পূর্ণাঙ্গবরন খীসার বিছানার উপর বসেছিল লোকটি। সে

আমাদের দুজনকে সন্দেহ চোখে তাকাচ্ছিল। ১০/১৫ মিনিট পরে পূর্ণাঙ্গ খীসার সাথে কানে কানে কি যে কথা বলে চলে গেল। এম এন, লারমা আমাকে বললেন "এই লোকটি টিকটিকি। পূর্ণাঙ্গ খীসা ইদানিং ৫৫ জন টিকটিকির সঙ্গে বেশ দহরম মহরম শুরু করেছে। তাদেরকে ছাত্রাবাসের ভিতর এনে তার বিছানায় বসে অনেক ক্ষন পর্য্যন্ত কথা বার্তা বলতে থাকে। আমার মনে হয় সরকার আমাকে ছাড়বে না। আমার পিছনে পূর্ণাঙ্গ খীসা অনেক দিন ধরে লেগেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার জন্যই পূর্ণাঙ্গ খীসা ৩০জন টিকটিকি ছাত্রাবাসে আনা নেওয়া করছে। আমার মন বলছে পুলিশ যে কোন সময়ে গ্রেপ্তার করবে। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কোন কাগজ পত্রে যদি আপত্তিকরমূলক লেখা থাকে সেগুলি আজকে শ্রীপুর ছাত্রাবাসে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে। সেখানেও তল্লাসী চলতে পারে [কারণ পাহাড়ী ছাত্র সমিতির প্রধান কার্য্যালয় ছিল তখন শ্রীপুর ছাত্রাবাসে]। তবে এই কথা মনে রেখো আমাদের দেশে একদিন আন্দোলনের জোয়ার আসবে। আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও তোমরা ঘাবড়িয়ে যেওনা। যে কোন ভাবে হোক না কেন পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা চালাইও।"

বিকাল প্রায় পাঁচটা বাজে। প্রয়াত নেতা লারমার নিকট থেকে বিষন্ন আর ক্ষুন্ন মনে বিদায় নিয়ে বের হলাম। ৬-৩০ মিনিটের ট্রেনে করে ফিরলাম শ্রীপুর ছাত্রাবাসে। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তখন আমরা আরো মর্মাহত হয়ে পড়লাম। কিন্তু তথাকথিত আদর্শবান ছাত্রেরা তাঁর গ্রেপ্তারের খবর শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো। আর ঘুনেধরা সামন্ত সমাজে তথাকথিত নেতা, বুদ্ধিজীবি ও চাকুরীজীবি যারা ড্রইং রুমের রাজনীতি, সমাজনীতিতেই পারদর্শী, যারা রাজনীতির নামে 'র' ও উচ্চারণ করতে সাহস করতো না, যারা কাপ্তাই বাঁধের মতো ধ্বংসাত্মক কার্য্যক্রমে কোন দিন প্রতিবাদ করেনি বরঞ্চ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে নিজের আখের গুছিয়েছে— তারা সবাই তরুন ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র লারমাকে পরমানন্দে নানাভাবে বিদ্রূপ করতে থাকে। যেমন—এবার নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে, যেমনি কর্ম তেমনি ফল, এতবড় সাহস যে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবে ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কালের গতিতে যারা একদিন তাঁকে বিদ্রূপ ও কটু বাক্য বর্ষন করেছিল, সেসব তথাকথিক স্বনামধন্য ব্যক্তিরা এক বাক্যে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে—হ্যাঁ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সত্যিই মানবের ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), অন্যত্র এত অনুন্নত পশ্চাৎপদ জুম্মজনগণের মধ্যে সেই একমাত্র নেতা। ইহা বাস্তব সত্য এক মাত্র মানবেন্দ্র লারমাই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম সত্যিকারভাবে জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে জুম্মজনগনের স্বার্থে কারাবরন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ও উগ্রধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষনের প্রতিবাদ এগিয়ে এসেছিলেন নির্ভয়ে। তিনিই ছিলেন জুম্ম-জাতির সংগ্রামী ইতিহাসে শাসক শোষক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

জেলে থাকাকালীন তাঁর সাথে আমার মাত্র তিনবার দেখা হয়েছিল। তার একটা বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সাদা রঙের কাপড় চোপড় খুবই পছন্দ করতেন। স্কুল এবং কলেজ জীবনে এমনকি চাকুরী জীবনেও সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট বেশী পড়তে দেখেছি। সেই জেলে থাকার সময়েও একই পোষাক পরিহিত অবস্থায় বার বার দেখেছি। তার সাথে কথা বলার সাহস করতে পারিনি কোনদিন। মনে ভয় ছিলো তার সাথে কথা বললে হয়তো পুলিশের লোকেরা আমাকে এবং তাঁকে অপদস্ত করবে। তখন অবশ্য পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বন্দীদের সাথে যে কথা বলা যায় সেটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এক বার কোর্ট থেকে যখন তাকে অন্যান্য বন্দীদের সাথে লাইন করে জেলে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ রাস্তার মধ্যে চোখাচোখি হয়। আমাকে দেখে একটু করে হাসলেন তিনি। সেদিনও সাদা প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিধান করেছিলেন। দেখলাম কাপড় চোপড় একদম ময়লা হয়ে গেছে। শরীর শুকিয়ে গেছে। হাতে হাতকড়া ছিল। সেদিন উনাকে যে দেখতে পাবো আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। ধীরে ধীরে প্রহরীরা চলে গেলে একবুক দীর্ঘনিঃশ্বাস অজান্তেই বের হয়ে গেলো। বুকে যে এক যন্ত্রণা নিয়ে আমি আমার আবাসে গেলাম সেদিন। ভাবলাম রাজনীতি জীবনের একমাত্র বন্ধু ও পথপ্রদর্শক আজ আমাদের থেকে অনেক দূরে।

এদিকে মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে। প্রয়াত নেতার মুক্তির কোন খবর নেই। সমাজে যারা নিজেদেরকে নামী দামী পণ্ডিত রাজনীতিবিদ আর সমাজসেবী ও জাতীয় নেতা বলে নিজেদের বাহাদুরির ঢং দেখায়, তারাতো ভুলেও কোনদিন লারমার মুক্তির ব্যাপারে মুখ খুলেন নি। রতনে রতন চিনে আর ভণ্ড ভণ্ডকে চিনে। তাই বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে অনেকেই জুম্মজনগণের দুঃখ দুর্দশা উপলব্ধি করতেন আর মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার দেশপ্রেম, জাতি প্রেম তথা মানব প্রেমের নিকট যারা জানতেন তারাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসলেন মুক্তির জন্য। আর সেই সব বাঙ্গালী হিতাকাঙ্খী দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বন্ধুদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি ১৯৬৫ সালের ৮ই মার্চ মুক্তিলাভ করেন যে দিন মানবেন্দ্র লারমা মুক্তিলাভ করেন, সেদিন স্বজাতিদের মধ্যে কজনেই বা উপস্থিত থেকে তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন দিয়েছিল।

ভাবলেও অবাক লাগে। জুম্ম জনগণ সে সময়ে কতোটানা ভয়ে ভয়ে থাকতো! অথচ অকুতোভয়ে সেইসব বাঙ্গালী বিপ্লবী বন্ধুরা চট্টগ্রামের জে, এম, সেন হলে এক বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে তরুণ ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে মাল্যভূষিত করে। সম্বর্ধনা সভায় শত শত লোক উপস্থিত ছিল। সেদিন সেই সম্বর্ধনা সভার পক্ষ থেকে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—'আমাদের মানবদা (মানবেন্দ্র লারমা) পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম দিশারী, যিনি আগামী দিনে একজন বড় রাজনীতিবিদ এবং জুম্ম জনগণের মুক্তির দিশারী হবেন। আমরা বাঙ্গালী হলেও একদিন আমাদেরকে তার থেকে রাজনীতির পরামর্শ নিতে হবে। বস্তুত পরবর্তী জীবনে আমরা তাই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখেছি।

কিন্তু তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ, তাঁর বিপ্লবী চেতনা এবং নির্যাতীত নিপীড়িত জুম্ম জনগণের মুক্তির দিশা, মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেশী বিদেশী চক্রান্তের খপ্পরে পড়ে জুম্ম জাতির মুক্তির অগ্রনায়ক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করলেও তাঁর আদর্শকে ধ্বংস করে দিতে পারেনি। যারা তাঁকে শত্রু ভেবেছিলেন— তাদেরকে তিনি ভেবেছিলেন নিতান্তই আপনজন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্ষমাশীল এবং অন্যধারে দয়াশীল। এই গুণের সুযোগে ক্ষমতালোভী জাতীয় বেঈমান গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র তাদের কয়েকজন বড় পান্ডা অনুগামী চাটুকার এদিন, এবং এর নেতৃত্বে পালিয়ে গিয়ে প্রিয় নেতাকে হত্যা করতে সাহস পেয়েছিল ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইং [illegible]। এরা জাতীয় ইতিহাসকে কলংকিত করেছে। জুম্ম জাতির ইতিহাসে জাতীয় শত্রু হিসেবে এদের নাম চিরদিন থাকবে। এই জাতীয় কুলাঙ্গারেরা জীবিত থেকেও মৃত। কিন্তু হে মৃত্যুঞ্জয়ী মানবেন্দ্র তোমার তো হয়নি মৃত্যু। তুমি অমর। তুমি বিশ্বের বিস্ময়। তুমি শহীদ। তোমার স্মৃতি চিরদিন আমাদের প্রেরণা জোগাবে। তোমাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের রূপরেখা

—শ্রীজিমি

পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ অশান্ত। সভ্য দুনিয়ার সচেতন সকল মানুষ জানে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন চলছে। কিন্তু কেন এই আন্দোলন? কিসের জন্য এই সশস্ত্র সংগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ কি চান—সে সম্পর্কে সবারের সাধারণ জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর জানতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা দরকার এবং এখানকার দশটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রূপ। প্রগাঢ়ভাবে চিত্র জানা দরকার। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সম্যকভাবে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য ছিল। ১৭৭০ সালে সর্বপ্রথম বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক এই রাজ্যটি আক্রান্ত হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে জুম্ম জনগণ জয়লাভ করলেও ১৭৭৭ সালে ঐ বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পুনর্বার পার্বত্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। কিন্তু সেই সংঘর্ষেও বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পর্যুদস্ত হয়। এতদসত্ত্বেও বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র সহযোগে নতুন সমর কৌশল নিয়ে বারম্বার আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৭৭৮, ১৭৮০ ও ১৭৮২ সালে যথাক্রমে অনুরূপভাবে উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়। অবশেষে ১৭৮৭ সালে অভিজাত শ্রেণীর কিছু সংখ্যক কুলাঙ্গারের বিশ্বাসঘাতকতায় তখন চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ দুর্বল হয়ে পড়লে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পরাজিত হয় এবং সেই বছরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তাবৎ অবস্থা সত্ত্বেও ১৭৮৭ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বৃটিশ সরকারের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না। কিন্তু ১৮৬০ সালে বৃটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতার স্বর্ণ চিরতরে অস্তমিত হয়ে যায়।

পরবর্তীতে "১৯০০ সালের রেগুলেশন" অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসিত হয়ে থাকলেও বৃটিশ শাসনের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় জুম্ম জনগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং জুম্ম জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে সর্বপ্রথম গঠিত হয় 'চাকমা যুবক সমিতি।' শ্রীরাজ মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে এই সমিতিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সমবেত হয়ে শিক্ষা, সমাজ, ধর্মীয়, জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

বৃটিশ শাসনের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবন দিন দিন অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখে বিশ দশকের গোড়ার দিকে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক শ্রীকৃষ্ণ কিশোর চাকমা এই অবক্ষয় ও অধঃপতনের হাত থেকে মুক্তি-লাভের প্রত্যাশায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। যেহেতু ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের কূপমণ্ডুকতার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল, সেহেতু তাঁর এই আন্দোলন জাতির ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯২০ সালেই শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে 'চাকমা যুবক সংঘ' গঠিত হয়েছিল। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে এইসব সমিতির কাজ ঢিমেতালে চলতে থাকলেও জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ তথা ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে কাজ করেছিল।

১৯২০ সালেই গঠিত হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি।" এই সমিতির কার্যক্রম মূলতঃ হেডম্যান ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার পরবর্তীতে যখন শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ও শ্রীস্নেহকুমার চাকমা এই সমিতিতে চল্লিশ দশকের প্রারম্ভে যোগদান করে তখন থেকেই এই সমিতিতে রাজনৈতিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। বৃটিশ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবে যাবে অবস্থা। এই সময়েই শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ও শ্রীস্নেহকুমারের নেতৃত্বে প্রচেষ্টা চলতে লাগলো যাতে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে শ্রীস্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে রাঙ্গামাটিস্থ ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং এই পতাকা পাকিস্তানের বেলুচ রেজিমেন্ট রাঙ্গামাটিতে না আসা পর্যন্ত ২১শে আগষ্ট অবধি উড্ডীন ছিল। কিন্তু সেই দিনটি ছিল জুম্ম

জাতির ইতিহাসে সব চাইতে বিড়ম্বনার দিন এবং সবচাইতে অন্যায় ও অবিচারের দিন। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তখন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সাতানব্বই সমস্ত দুই ভাগের এক পার্সেন্ট ভাগই ছিল অমুসলমান। তথাপি Major Billy short এর সুপারিশক্রমে Bengal Boundary Award commission এর chairman Sir cyrill Redcliffe এর কারসাজিতে জুম্ম জনগণ মুসলমানদের আবাস ভূমি পাকিস্তানের জ্বলন্ত গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

এদিকে উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তানের শাসন অন্তদিক সেই শাসনেরই আজ্ঞাবহ কূপমণ্ডুক সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব—এই দুই শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে জুম্ম জনগণের সার্বিক অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন মেনে চলায় যদিও পাকিস্তান সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল তথাপি পাকিস্তান সরকার নির্লজ্জভাবে এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে। পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকে ক্রমেই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন যন্ত্রে মুসলমান বাঙ্গালীদের আধিক্য বাড়তে থাকে এবং সমস্ত ব্যবসায়িক অর্থনীতি মহাজনী পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকে। এহেন পরিস্থিতি লক্ষ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের মনে সীমাহীন হতাশার সৃষ্টি করে। এই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে ১৯৫৬ সালে ছাত্রনেতা অনন্ত বিহারী খীসা ও সুধাংশু খীসার নেতৃত্বে জুম্ম ছাত্র সমাজ সম্মিলিত সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন দাবী দাওয়া তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশ করেছিল। সমসাময়িক কালে Buddhist স্টাইপেণ্ডের বিশেষ অনুদানগুলো সংখ্যানুপাতে Plain Buddhist ও Hill Buddhist ছাত্রদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করিয়ে দেবার আন্দোলনও চালানো হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যাকাশে সবচাইতে কঠিনতম আঘাত আসে ১৯৬০ সালে। ঐ বছরই কাপ্তাই বাঁধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এই বাঁধের ফলে এলাকার সবচাইতে উর্বর ও নির্ভরযোগ্য শস্যাগারটি জলমগ্ন হয়ে পড়লে জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ফলে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। প্রায় ষাট হাজারেরও বেশী মানুষ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বার্মাতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এইসব অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করার পর তরুণ ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৬২ সালে পাহাড়ী ছাত্রদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রের হীন মুখোশ উন্মোচনার্থে এক বিবৃতি প্রদান করেন এবং ঐ সম্মেলনে পাকিস্তানের কুশাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন—পাকিস্তান সরকার জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে অবলুপ্ত করে দিতে বদ্ধপরিকর। অথচ ঘুনে ধরা সামন্ততান্ত্রিক জাতীয় নেতৃত্ব এদের কোন বিহিত করার কথাও ভাবেনা। তখনই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। এই প্রেক্ষিতে জুম্ম ছাত্রদেরকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে জুম্ম সমাজের শিক্ষা বিস্তার সহ জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করার আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তীতে সম্মেলনের গৃহীত এই সিদ্ধান্ত সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯৬৬ সালে জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও নব জাগরণের আরো একটি অবিস্মরণীয় বৎসর। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসেই বর্তমান নেতা সন্তু লারমা ও সমাজসেবী অনন্ত বিহারী খীসার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি কল্যাণ পরিষদ" (The Chittagong Hill Tracts Welfare Association)। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল জুম্ম জনগণের মধ্যে একটি প্রগতিশীল জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো। এই ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি কল্যাণ পরিষদ' পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও সন্তু লারমার নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি' সম্মিলিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ আনয়নে ও নেতৃত্ব গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই পরিষদ পরবর্তীকালে জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। যুগ যুগ ধরে যে জাতি অশিক্ষা কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছিল সেই জাতি সেই প্রথম জাতীয় চেতনাবোধ নিয়ে লক্ষনীয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে।

এই কল্যাণ পরিষদের নেতৃত্বেই ১৯৭০ সালে সচেতন দেশপ্রেমিকদের নিয়ে "নির্বাচন পরিচালনা কমিটি" গঠন করা হয়। এই নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নির্বাচনী ঘোষণাতে ১৬ দফা দাবী উত্থাপনের অঙ্গীকার করা হয়। তন্মধ্যে জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি সহ স্বায়ত্বশাসনের দাবী সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনে এই কমিটি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জয়যুক্ত করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে এক নব দিগন্তের সূচনা করে।

বাংলাদেশ আমল

এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তার মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারে নিষ্পেষিত জুম্ম জাতি ভেবেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে কিন্তু বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের সাথে সাথে মুক্তিবাহিনী তথা বাংলাদেশ সরকার নারী ধর্ষণ, লুটপাট, রাহাজানি, খুন, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া, ধর পাকড়, জেল জুলুম ইত্যাদি সর্বপ্রকারের নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকে। সর্বোপরি বাঙালী মুসল-

মানের বেআইনী অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করার কার্যক্রম ও সুপরিকল্পিতভাবে কার্যকরী হতে থাকে। পাকিস্তান সরকার যা করতে সাহস করেনি, আওয়ামী লীগ সরকার তাই বাস্তবায়িত করতে থাকে। এতে জুম্ম জনগণ আরো শঙ্কিত হয়ে উঠে। এইসব ঘটনাবলী জুম্ম সমাজকে আরো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল যে এইসব নির্যাতিত ও বঞ্চিত জাতি সমূহের সংগ্রাম করা ব্যতীত বেঁচে থাকার অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। তাই ১৯৭০ সালে গঠিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অবিসংবাদী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে নির্যাতিত জাতিসমূহের বেঁচে থাকার একমাত্র সনদ "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" গঠন করা হয়। এই দিনটি ছিল গোটা জুম্ম জাতির রাজনৈতিক তথা জাতীয় জাগরণের এক ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় দিন।

শুরু হলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মংরাজা মংপ্রুসাইন চৌধুরী ও গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে একটি স্মারক লিপি বাংলাদেশের মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। ঐ স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে "সর্বকালের সর্বযুগে আদিমকাল থেকে শুরু করে মানব সভ্যতার বিকাশ পর্যন্ত প্রত্যেক জাতি ছোট হোক বড় হোক সবসময় নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মাধ্যমেই আপন জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচিতি বজায় রাখবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসতেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন ব্যবস্থা তুলে দিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছোট ছোট জাতি সমূহ নতুন শাসন ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে—ইহা যাঁরা ভেবে দেখেছেন তাহলে ইহা একটি মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং 'উপযুক্তরাই বেঁচে থাকবে'—এই প্রবাদটিও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। কারণ আমরা 'উন্নত জাতি তো নয়ই বরঞ্চ পিছিয়ে পড়া জাতি'—যাদের জীবন পদ্ধতি, উপজাতীয় সংহতি, সংস্কৃতি সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস প্রথা, প্রবাদ এবং ভাষা কলমের খোঁচায় মুছে দেওয়া যাবে না সেইজন্য এই জাতির নিরাপত্তার জন্য যে পৃথক আইনে পরিচালিত একটি পৃথক অঞ্চলের প্রয়োজন ইহা পুরোপুরি অনস্বীকার্য।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে যাতে এই পিছিয়ে পড়া জাতি সমূহের অধিকার সংরক্ষিত হয় তার জন্য নিম্নলিখিত ৪টি দাবী এই সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়—

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে;

২) উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম" শাসন বিধি'র ন্যায় অনুরূপ 'সংবিধি ব্যবস্থা' (Statutory Provision) শাসনতন্ত্রে থাকবে;

৩) উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে;

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচায়ের ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ 'সংবিধি ব্যবস্থা' শাসনতন্ত্রে থাকবে।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস উগ্রজাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ সরকার এইসব দাবীদাওয়ার প্রতি কোন বিচার বিবেচনা না করেই এক তরফাভাবে জুম্ম জনগণকে 'বাঙ্গালী' হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এই সময় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'ও তার সংগ্রামের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এই সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জুম্ম ছাত্রদের সংগঠিত করতে থাকে এবং বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় নির্যাতন নিপীড়ন ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জঙ্গী মিছিল ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে বার বার প্রতিবাদ করতে থাকে। এই সমিতি বাংলাদেশ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যেতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী-দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়, তার সমর্থনে এগিয়ে এসে—১৯৭২ সালের ৯ই জুন এক ঐতিহাসিক সর্বদলীয় ছাত্র মিছিল পরিচালনা করে। মিছিলের পর রাঙ্গামাটির কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে ছাত্ররা সমবেত হয় এবং রাঙ্গামাটিস্থ ডেপুটি কমিশনারের নিকট দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত দাবী সমূহ উত্থাপন করা হয়েছিল—

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করতে হবে;

খ) বিনা বিচারে আটককৃত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করতে হবে;

গ) গণহত্যা বন্ধ করতে হবে;

ঘ) নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে;

ঙ) কাপ্তাই বাঁধ মরন ফাঁদের ফলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হবে;

চ) পাহাড়ী ছাত্রদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

কিন্তু বার বার দাবী দাওয়া পেশ করা সত্বেও বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করতে একটুও দ্বিধা বোধ করে নি। বরঞ্চ এক কলমের খোঁচায় সমগ্র জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার আশায় বাংলাদেশ সংবিধানে জুম্ম জনগণকে বাঙ্গালী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এর প্রতিবাদ স্বরূপ পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও আরো বেশী সোচ্চারে আরো বেশী জঙ্গীরূপ নিয়ে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সাথে

একই কাতারে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, যার ফলে আওয়ামী লীগের সমর্থনের প্রবল জোয়ারের সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ অতি শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত ও পরাজিত হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। শুরু হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পালা। কিন্তু জুম্ম জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হলো না। উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদের রূপের সাথে যুক্ত হলো উগ্র ধর্মান্ধ রূপ। তাই আওয়ামী লীগ সরকারের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করার জন্য উগ্র ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী জিয়াউর রহমান সরকার উঠে পড়ে লেগে গেল। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত করে দেয়ার হীন কার্যক্রম একটার পর আরেকটা ক্রমাগত বাস্তবায়িত হতে লাগলো। তথাকথিত যৌথ খামার ও আদর্শ গ্রাম করে জুম্ম জনগণকে পাইকারীভাবে কারাবন্দী করা হলো। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের দমনের নামে নিরীহ ও নিরপরাধ জুম্ম জনগণের উপর চলতে থাকে জেল জুলুম মারপিট, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড ও নানা ধরণের অত্যাচার উৎপীড়ন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা শত শত জুম্ম কিশোরী, যুবতী ও নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার হতে থাকে। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হতে থাকে। শত শত নিরীহ ও নিরপরাধ জুম্মকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হতে থাকে। সমগ্র দেশে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা তথা জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী জিয়া সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে বে আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ সুপরিকল্পিত ভাবে ঘটাতে থাকে। শুধু তাই নয় বে আইনী অনুপ্রবেশকারীরা সশস্ত্রবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জুম্ম জনগণের জমি বেদখল করতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তথাকথিত উন্নয়নের সিংহভাগই সামরিক তৎপরতা ও বে আইনী অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চাতে ব্যয় হতে থাকে। অপারেশনের পর অপারেশন। এইভাবে জাতীয় জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। জুম্ম জনগণ তাদের প্রতি এইসব অত্যাচার, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ জানাতে থাকে। কিন্তু সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার এ যাবৎ কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই তার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে থাকে। যা আজ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আবহমান কালের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে জুম্ম জাতি যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। জুম্ম জনগণ চেয়েছিল নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতিবিধান করে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে কিন্তু ভাগ্যের একই নির্মম পরিহাস যে, যুগে যুগে এই জাতি নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে বার বার বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। জুম্ম জনগণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে চায়—তাই নিজেদের জাতীয় উন্নয়ন ও অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য বারম্বার প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিক দাবী দাওয়াগুলোর প্রেক্ষাপটে এটা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তারা কোনদিন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বিশ্বাস করেনি এবং বর্তমানে ও সকল প্রকারের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধিতা করে। জুম্ম জনগণের একমাত্র দাবী জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জুম্ম সমাজের সার্বিক উন্নতি বিধান করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে মানব জাতির মঙ্গল সাধন করা। সুতরাং জনসংহতি সমিতি বাস্তবতার আলোকে এই নীতির উপর ভিত্তি করে তার আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

জনসংহতি সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মানবতাবাদই হচ্ছে জনসংহতি সমিতির আদর্শ। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার—এই মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগে শাসক শোষক গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার উৎপীড়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবগোষ্ঠী পদদলিত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। যুগ যুগ নিপীড়িত ও জুম্ম জনগণ আজ অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতির আদর্শ মানবতাবাদ চারটি মূলনীতি—গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ এই চারটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর নিপীড়িত শোষিত ও বঞ্চিত জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দলীয় আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে— চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম, মুরুং, খেয়াং, পাংখো, খুমী, চাক ও লুসাই— এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অর্থাৎ—

ক) উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের শাসন শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনা থেকে দশভাষাভাষি জুম্ম জনগণকে মুক্ত ও তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে—

১) পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য [illegible]-

২) আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করণ ;

খ) ১) ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দশটি জাতির মধ্যে ভেদাভেদ নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা দূরীকরণ ;

২) এই জাতি সমূহের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করণ ;

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করণ ;

যে কোন সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্দ্ধারণ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় তথা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বাস্তবতার উপর বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি যুগ যুগ ধরে শাসিত ও অবহেলিত সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে শাসিত ও শোষিত ; যেহেতু জুম্ম জাতি সর্বক্ষেত্রে খুবই পশ্চাৎপদ সর্বোপরি উগ্র ধর্মান্ধ সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার অধিকতর শক্তিশালী সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি—

১) নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, কৌশলগতভাবে জাতিধর্ম, দলমত নির্বিশেষে সাহায্য চাওয়া ; এবং

২) নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা—সংগ্রামী নীতি কৌশল নির্দ্ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য এই নীতি ও কৌশলের ভিত্তিতেই সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে।

কেন এই আত্মনিয়ন্ত্রনিধিকার আন্দোলন

পৃথিবী জুড়ে আজ নিপীড়িত ও শোষিত জাতিসমূহ সকল প্রকারের শোষণ ও বঞ্চনার নাগপাশ ছিন্ন করে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। ন্যায্য অধিকার জুম্ম জনগণও পেতে চায়। মানুষের মত বেঁচে থাকার সনদ তাদেরও ন্যায্য পাওনা অথচ জুম্ম জনগণের জন্মভূমির অস্তিত্ব আজ পুরোপুরি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। উগ্র ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার আজ জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করে দিতে পুরোপুরি কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান ও সম্প্রসারণবাদের নির্মম নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামই জুম্ম জনগণের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এই জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের দেশ প্রেমিক জুম্ম জনগণ সকল প্রকারের নিপীড়ন, শোষণ, ও বঞ্চনার অবসান করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

যুগে যুগে দেশে দেশে মৌলিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের দুটি উপায় গ্রহণ করা হয়ে আসছে। একটি নিয়মতান্ত্রিক ও অপরটি হচ্ছে অনিয়মতান্ত্রিক। ইহা কারো অবিদিত নয় যে, শাসক গোষ্ঠীর সকল প্রকারের নিপীড়ন, বঞ্চনা ও শোষণ বন্ধ করা তথা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জুম্ম জনগণ বারে বারে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবী দাওয়া পেশ করে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু বারে বারে ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক অদুরদর্শিতা সংকীর্ণ মানসিকতা উগ্র ধর্মান্ধ জাত্যাভিমান শেষ পর্যন্ত জুম্ম জনগণকে অনিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে কিন্তু বিশেষ কতকগুলো কারণেই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারে আদায়ের রূপ পরিবর্তন করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তা হচ্ছে—

১) উগ্র ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব এবং নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি ;

২) শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অদুরদর্শিতা, সংকীর্ণতা, উগ্র জাত্যাভিমানী শাসন নীতি ও কৌশল ;

৩) নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করা সত্বেও কোন দাবী দাওয়া পুরণ না হওয়া ;

৪) নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া।

এইসব কারণেই জন সংহতি সমিতির নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী গঠন করতে হয়েছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে জুম্ম জনগনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশের ছাত্র ও যুব সমাজ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণে এদেশের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে শিক্ষক সমাজের অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি ছাত্র ও যুব সমাজের দেশপ্রেম, ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামী মনোভাব জাতীয় জাগরণ আনয়নের পথ সুগম ও ত্বরান্বিত করেছে। সর্বোপরি সর্বহারা জুমিয়া ও ভূমিহীনদের সমর্থন ও সহযোগিতা দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগনকে ঐক্যবদ্ধ করে আত্ম-নিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রাম করা সম্ভবপর হয়েছে। এক কথায় এদেশের ছাত্র, শিক্ষক, যুব সমাজ, সর্বহারা জুমিয়া ও ভূমিহীনদের সম্মিলিত সংগ্রামী মনোভাব ও মহান কর্ম কাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। কিন্তু দেশ প্রেমের পাশাপাশি দেশদ্রোহিতাও বিশ্বাসঘাতকতার নজীর যুগে যুগে সর্ব দেশের আন্দোলনে পরিলক্ষিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম নেই। সমাজের এইসব স্বার্থবাদী, সুবিধাবাদী ও পা চাটা চাটুকারের

যুগে যুগে মানবজাতির স্বার্থকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি দিয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই স্বার্থবাদীও সুবিধাবাদী চাটুকারেরা, সমাজে স্মরনাতীতকাল থেকে অধিকার আদায়ের আন্দোলন তথা প্রগতির চরম বিরোধীতা করে আসছে। ১৭৮৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ দশকের শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির আন্দোলনে, ষাট দশকের জাতীয় জাগরণের সময়কালে এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে এইসব বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থবাদীও পা-চাটা চাটুকারেরা বারে বারে স্বীয় স্বার্থের কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে জুম্ম জাতির চরম সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে সমাজের এইসব দুষ্ট কীটদের রূপ আরো নগ্ন হয়ে পড়েছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এদের চাটুকারী কলা কৌশল শিকড় গেড়ে বসেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে সামিল না হয়ে সমাজে এই জঞ্জালগুলো শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সমগ্র জাতিকে পশ্চাৎভাগ থেকে ছুরিকাঘাত করে চলেছে। এইসব স্বার্থবাদী, সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল (সাধারণের ভাষায় "তুলা") দের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে জনস্বার্থ পরিপন্থী সংগঠন। এইসব জনস্বার্থ পরিপন্থী সংগঠনগুলোর মধ্যে উপজাতির সম্মেলন (Tribal convention), মার্মা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত সংগঠনের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণবাদী শাসক গোষ্ঠী এদেশের ছাত্র সমাজ তথা জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বানচাল করতে সদা ব্যস্ত। অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণেরই সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সাফল্যের উপরেই নির্ভর করছে এদেশের আপামর জনগণের সুখ সমৃদ্ধি ও আশা আকাঙ্খার পূর্ণ বাস্তবায়ন। তাই এই আন্দোলনে আরো অধিক হারে এদেশের ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, বুদ্ধিজীবি সমাজ, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, চাষী তথা সর্বস্তরের জুম্ম জনগণের এগিয়ে আসা বাঞ্ছনীয় যাতে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সুবিধাবাদী 'তুলাদের' সকল প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা বন্ধ করে দিয়ে সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের শাসন ও শোষন উৎখাত করে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের পথ সুগম ও বিজয়ের পথ ত্বরান্বিত হয়ে উঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের আওতাধীনে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার পেতে চায়। বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের শান্তিকামী জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হতে চায়। জুম্ম জনগণের এই সংগ্রাম একটি ন্যায্য ও যুক্তিসংগত সংগ্রাম। জুম্ম জনগণের সমস্যা কোন আঞ্চলিক কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যা নয় ইহা বাংলাদেশের একটা জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবি রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও যুব সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন তথা আপামর জনগণের কর্মসূচী ভিত্তিক নৈতিক সমর্থনের উপস্থিতি একান্তই কাম্য ও বাঞ্ছনীয়।

সর্বোপরি আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করা তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক দেশ Survival International, Amnesty International এর মত বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থা এবং মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বের নৈতিক সমর্থন, সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা ও একান্ত কাম্য ও বাঞ্ছনীয় যাতে সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার সকল প্রকারের নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ করে মৌলিক অধিকার প্রদানে বাধ্য হয়।

যে সব অনিবার্য ও দুর্নিবার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ অশান্ত তার জন্য আগের ও বর্তমান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন নীতিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। বর্তমান সামরিক সরকার এইসব কারণাদি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের সাফাই গেয়ে পূর্বতন সরকারগুলোকেই দায়ী করার প্রয়াস পায়। অথচ বর্তমান সরকার আগের সরকারগুলোর অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত তো করেই চলেছে; তদুপরি নিত্য নতুন দমন ও উচ্ছেদের নীতি প্রয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক অবস্থা চরম পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। যার ফলে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জুম্ম জনগণের অঘোষিত যুদ্ধের মাত্রা ও রূপ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা দিনের পর দিন জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করে চলেছে। অথচ এই সমস্যা বাংলাদেশ সরকারকেই একদিন না একদিন সমাধা করতেই হবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটা আর বর্ধিত করতে না দিয়ে পূর্ণ সদিচ্ছা সহ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিৎ। বে আইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করে, যারা ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এবং সামরিক নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ করলেই তবে রাজনৈতিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্থ হতে পারে।

কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য যে, রাজনৈতিক উপায়ে বাংলাদেশ সরকার সমস্যা সমাধানের জন্য এযাবৎ তেমন কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের নামে, বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা সাহায্য এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং মূল সমস্যাটি আরো তীব্রতর করে তুলছে। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে বাংলাদেশকে সাহায্য

প্রদানকারী দেশগুলোর উচিত সেসব সাহায্য বন্ধ করা কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্যাকে আশু সমাধান করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

যদিও আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলনের মাঝ পথে দেশী বিদেশী গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের সাহায্যে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র ষড়যন্ত্র করে আন্দোলনকে তার মূলনীতি আদর্শ থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী করতে চেয়েছিল কিন্তু বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্রিয় বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমার) বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চক্রান্তকারীদেরকে সাফল্যজনকভাবে উৎখাত করা সম্ভবপর হয়েছে। দলের ভেতরকার এইসব সুবিধাবাদী বিভেদ পন্থীদের বিতারণের ফলে দল আগের চাইতে আরো বেশী শক্তিশালী হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে নিতে ও সাফল্যমণ্ডিত করতে আগের যে কোন অবস্থার চাইতে জনসংহতি সমিতি বর্তমান নেতার নেতৃত্বে আজ অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং সংগ্রামী অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট।

আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সংগ্রাম ছয় লক্ষাধিক জুম্ম জনগণের বাঁচা মরার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ন্যায় ও যুক্তিসংগত সংগ্রাম। তাই অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাত এবং রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়েও এই সংগ্রাম আজো এগিয়ে চলেছে। সুনির্দিষ্ট নীতি আদর্শের ভিত্তিতে আর ধাপে ধাপে এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন যেমনি লাভ করে চলেছে, তেমনি জুম্ম জনগণও সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলনের সাথে আরও সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। যত দিন জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভুমির অস্তিত্ব সংরক্ষনের সাংবিধানিক গ্যারান্টি সুনির্দিষ্ট হবেনা, ততদিন এই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সংগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলবেই।

একজন বিভ্রান্ত কর্মীর গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা

—শ্রীকুশল

আমি জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন-শান্তিবাহিনীর একজন ইউনিট কম্যাণ্ডার। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন আমার কর্মক্ষেত্র ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সুদূর দক্ষিণাঞ্চল আরাকানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। আমার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্মকর্তা ছিল জাতীয় বেইমান গিরি-প্রকা-শদেবেন-পলাশ চক্রের অন্যতম হোতা রোম্পিও (দীপায়ন) ও সুমন (অঞ্জয়)। গৃহযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমার কর্মক্ষেত্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনের উপর যৎসামান্য হলেও আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, ম্রুং, বোম, খিয়াং, পাংখো, খুমী, চাক ও লুসাই—ভিন্ন ভাষাভাষি এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। আমার সৌভাগ্য যে আমার কর্মক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে এই দশটি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি স্মরণা-তীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে। তবে এতদ অঞ্চলে মার্মা ম্রুং ও বোম জাতির সংখ্যাধিক্য বেশী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্মা ও বোমরাই অগ্রগামী। তবে তুলনামূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের চাইতে এই অঞ্চল সর্বক্ষেত্রে অকল্পনীয়ভাবে পিছনে পড়ে আছে। বহির্বিশ্বের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণা-ঞ্চলের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। সহজ সরল জীবনের অধিকারী এতদ অঞ্চলের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বহিরাগত মহাজনী পুঁজির শোষণে জর্জরিত। চাষযোগ্য জমি নেই বললেই চলে। অধিবাসী-দের ৯১% জনই জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার উৎপীড়ন, অপর দিকে উগ্রধর্মান্ধ বাঙ্গালী সম্প্রদায়বাদের শাসন শোষণে এই অঞ্চলের জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়; প্রকৃতির উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল জাতীয় জীবন আজ সন্ত্রস্ত, বিপর্যস্ত ও অনিশ্চিৎ। কেননা প্রকৃতি আগে যেভাবে ফলন দিত, কালের প্রবাহে আজ সেই প্রকৃতি অনুর্বর হয়ে উঠেছে। অপর দিকে শিক্ষা দীক্ষার অভাবে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ধারক বাহক এই পিছিয়ে পড়া জন গোষ্ঠী আধুনিক কালের অর্থনীতির সাথে খাপ খাওয়াতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তার উপরে বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে জুম্ম জনগণের এক কালের সুখ ও শান্তিপূর্ণ জীবন ধারা আজ ক্ষত বিক্ষত। যেটুকু চাষযোগ্য জমি ছিল আজ সেসব জমিই বহিরাগত বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা বেদখল হয়ে গেছে। ব্যবসা বানিজ্য সবই বাঙ্গালী মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে—তাই এতদঅঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে যে আত্মনিয়ন্ত্রনা-ধিকার আন্দোলন—সেই আন্দোলনের প্রবাহেও এই অঞ্চলের জুম্মরা সিক্ত না হয়ে পারেনি। তারা অশিক্ষিত অনুন্নত হতে পারে কিন্তু তাদের মনেও রয়েছে দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম। তাইতো বিগত এক যুগ ধরেই তারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তারা স্বপ্ন দেখে একদিন এই জুম্মদেশ উগ্র ধর্মান্ধ সম্প্রদায়বাদী বাংলাদেশ সরকারের শাসন থেকে মুক্ত হবে—তখন তাদের অভাব থাকবেনা—শিক্ষার সুযোগ পাবে— মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকার পাবে। তাইতো এই অশিক্ষিত- অনুন্নত, সরল ও সহজ জীবনের অধিকারী দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণও সর্বাত্মক ভাবে জনসংহতি সমিতির নীতি, আদর্শ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমরা ও শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির কর্মীবাহিনী জুম্ম জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিলাম। কিন্তু গৃহযুদ্ধের কারণে মূলতঃ এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় কমাণ্ডার ও পরিচালকের ভুল নেতৃত্ব ও চরম প্রতিক্রিয়ার জন্য দক্ষিণা-ঞ্চলে পার্টি ও জনগণের একাংশের মধ্যে সৃষ্টি হলো বিভেদ—দেখা দিল অবিশ্বাস ও চরম তিক্ততা। যার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণাঞ্চলের শান্তিবাহিনী তথা সমিতির সংগঠন সাময়িক কালের জন্য হলেও ভেঙ্গে পড়েছে। এবং ঘাঁটি এলাকা গেরিলা অঞ্চলে পরিণত হয়ে পড়েছে।

জাতীয় কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের হীনচক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের সেক্টরের প্রায় সকল সদস্যদেরই অজানা ছিল। ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনের সবকিছুই আমাদের থেকে গোপন রাখা হয়। পলিটিক্যাল সেক্রেটারী সুমন যে ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিল, সেও সেক্টরে ফিরে এসে এ সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের সামনে কোন কিছুই রিপোর্ট করেনি। এমনকি কেন্দ্র থেকে প্রেরিত নির্দেশ ও পরামর্শ সম্বলিত সমস্ত দলিল পত্রাদিও গোপন রাখা হয়। সুমন-রোম্পিও গোপন পরামর্শ করে মাত্র গুটি

কয়েক তাদের একান্ত বিশ্বস্তদের নিকট বিভেদপন্থী চার কুচক্রীদের দ্বারা সৃষ্ট ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত করে। তাই আমরা দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সমস্ত কর্মীরাই উপদলীয় চক্রান্ত সম্পর্কে যেমনই অবহিত ছিলাম না, তেমনি পার্টির অগ্রগতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারিনি।

চক্র হোতা অনুরায় ১৯৮২ সালে এক কোম্পানী জনশক্তি নিয়ে যখন সেক্টরে পৌঁছে গেল তখন আমাদের মধ্যে কতই না উল্লাসের ঢেউ বয়ে যায়। কত না জল্পনা-কল্পনা। আমাদের দক্ষিণের শক্তি বেড়ে গেছে এবার শত্রুর উপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো—কতই না অন্তরে আনন্দ ও উদ্যোগ। কিন্তু না, ঘটে গেল ১৭ই জুনের অনাকাঙ্খিত সংঘর্ষ। আমরাও রেডিওতে শুনলাম—পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে—১৪ই জুন ভাইয়ে ভাইয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়ে গেছে। আমরা হতবাক্ হয়ে গেলাম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যদিও এটা বাস্তবতা। জিজ্ঞাসা করলাম রোজিও ও সুমনকে বার বার। কিন্তু প্রতিবারেই এরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চার কুচক্রীর উপদলীয় চক্রান্তের জঘন্য কাহিনী কৌশলে এড়িয়ে গেছে। তখন শুধু জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসা কিন্তু এই জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি ঘটেনি যতদিন না পর্যন্ত মধ্য অঞ্চলে এসে নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মীদের সাথে দেখা হয়। শেষ পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করনার্থে সিদ্ধান্ত ক্রমে রোজিও ও নবায়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য রোজিও ও নবায়ন কেন্দ্রে আসার ভান করে চার কুচক্রীর সাথে একত্রিত হয় এবং চার কুচক্রীর চাটুকার নবায়নকে রেখে কেন্দ্রের সাথে কোন যোগাযোগ না করেই একাই ফিরে আসে।

এক অস্বস্তিকর ও অনিশ্চিৎ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। এলাকার সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ যারা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক তাদের মনেও ছিল না কোন শান্তি। তার উপরে সেক্টরের কয়েকজন দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থবাদী দায়িত্বশীল কর্মী যারা চক্রান্তের হোতা রোজিও ও সুমনের অনুগামী তাদের জনস্বার্থ পরিপন্থী কার্যকলাপের দ্বারা সমগ্র এলাকাবাসী বিশেষতঃ মুরুং জাতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। উল্লেখ্য যে এসব নীতিচ্যুত কর্মীদের হীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রোজিও সুমন কোন পদক্ষেপ তো নিলোই না বরঞ্চ তাদেরকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে লাগলো যাতে তারাও দলীয় নীতি পরিপন্থী কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত টাকার অংশ খেতে পারে। জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। ঠিক এমনি সময়ে বাংলাদেশ সরকারে সশস্ত্র বাহিনী তৎপর হয়ে উঠে। শত্রু বাংলাদেশ সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র এলাকায় সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যেমন ডাকাতি, রাহাজানী ইত্যাদিতে জড়িত লোকদেরকে সংগঠিত করে পার্টির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। সেক্টরের কয়েকজন সদস্য নীতিচ্যুত হয়ে সশস্ত্রভাবে পালিয়ে যায়। ফলে সমস্ত অঞ্চলে একটা চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। একটা সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প আকাশে বাতাসে সৃষ্টি হতে থাকে। সমগ্র এলাকায় যখন এমনিতর অবস্থা তখন রেডিও সংবাদে জানা গেল ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইংরেজী চার কুচক্রীদের চক্রান্তমূলক এক অতর্কিত হামলায় জুম্ম জাতির কর্ণধার মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা তার আটজন সহকর্মীসহ নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে সমগ্র সেক্টরে একটা চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। যারা দলীয় নীতি আদর্শে অনুগত তারা মর্মাহত ও হতবাক হয়ে গেল, আর যারা চারকুচক্রীর সমর্থক রোজি ও সুমনের অনুগামী তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। কিন্তু সেক্টরের অধিকাংশ সদস্যই নেতার হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারেনি। আবার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত হল আমাদের সেক্টর নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলবে। সুতরাং উভয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কম্যাণ্ডার রোজিও (দীপায়ন) কে উত্তরাঞ্চলে পাঠানো হউক।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোজিও রওনা দেয়। কিন্তু জাতির কুলাঙ্গার, বিশ্বাস ঘাতক রোজিও উত্তরাঞ্চলে চলে গেল সত্য কিন্তু কেন্দ্রের সাথে কোন প্রকারের যোগাযোগ না করেই শুধুমাত্র চারকুচক্রীর সাথে গোপন সলাপরামর্শ করে ফিরে এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো সুরতন রাজ্যের দিগবিজয়ের বস্তাপচা কাহিনী। রোজিও ফিরে আসার পর বসে যায় রোজিও, অনুরায় ও নবায়নের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক। শেষ পর্যন্ত চারকুচক্রীর পক্ষে সেক্টরের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সামনে মিথ্যার বেসাতি জোড়ালোভাবে শুরু করলো। তারা বললো লারমা পক্ষে আর কার্যকরী ক্ষমতা নেই—তাদের নেতৃত্ব দুর্বল, সন্ত লারমা মুমূর্ষ অবস্থায়। অপর দিকে সমস্ত কিছু গিরি-প্রকাশের অনুকূলে। কেননা বর্তমানে চারকুচক্রীর পক্ষে রয়েছে তথাকথিত অঢেল বৈদেশিক সাহায্য, ব্যাপক জুম্ম জনগণ তাদের স্বপক্ষে রয়েছে। বিদেশেও রয়েছে তাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, সর্বোপরি উত্তরাঞ্চলের প্রায় জোন সেকটর বর্তমানে চক্রান্তকারীদের অনুগত। মাত্র তিন ও পাঁচ নম্বরের ইউনিট লারমা পক্ষের অনুকূলে রয়েছে। সুতরাং এই সময়ে যদি পক্ষাবলম্বন না করি তাহলে এই সেক্টরের পরিণতি খুবই মারাত্মক হয়ে উঠবে। এভাবে চারকুচক্রীর অন্যতম হোতারা সেক্টরের সকল সদস্যদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে শুরু করলো।

সঙ্গে সঙ্গে রোজিও সুমন একটা প্রস্তাব দিল যে—এই সুযোগে আমাদের তিন ও পাঁচনম্বর দখলে আনা যুক্তি যুক্ত হবে। কেননা এই জটিল মুহূর্তে যদি আমরা তিন ও পাঁচ নম্বরের পৌঁছে যায়, তাহলে বিনাযুদ্ধে তা দখলে আসবে আর দুই তিন মাস পরে নতুন কর্মী ভর্তি

করে পুনরায় এই সেক্টরে এক কোম্পানী ফেরৎ পাঠানো যাবে। একদিকে প্রস্তাব রাখলো অপরদিকে বিশ্বাসঘাতক রোস্মিও এই হুমকিও দিল যে—যে কেউ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে তার বিরুদ্ধে 'বাহীদের' আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান করা হবে। উল্লেখ্য যারা এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি তারাও জীবনের ভয়ে কোন কথায় বলতে সাহস করেনি। কারণ সমস্ত সেক্টরে একটা সন্ত্রাস ও সন্দেহ বিরাজমান ছিল।

প্রস্তাব অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারী রোস্মিও সুমন নগদ নয় লক্ষ টাকাও সেক্টরে সংরক্ষিত স্বর্ণ পকেটস্থ করে করে ৯৮ (আটানব্বই) জন সশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তিন ও পাঁচ নম্বর দখলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু চক্রান্তকারীদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস—তাদের এই দিবাস্বপ্ন শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারেনি। রোস্মিও, সুমন ও এমং নগদ অর্থ ও স্বর্ণ নিয়ে কৌশলে সরে যায় আর অন্যান্যরা শেষপর্যন্ত পার্টির অনুগত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে তিন ও পাঁচ নম্বরের অনুগত বাহিনী আত্মসমর্পিত বিপথগামীদের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে চারকুচক্রীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে। রোস্মিও সুমনের ছলনাও কারসাজি সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়ার আগেই সেক্টরের সামগ্রিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর্যুপরি হামলা, নীরিহ ও নিরপরাধ জনগণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন, এলাকার জনগণের একাংশের সাথে সেক্টরের দ্বন্দ্ব সংঘাত—সব কিছু মিলিয়ে ঘাঁটি এলাকা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়লো।

ঠিক এমনি সময়ে রোস্মিও সুমনের সাথে যাওয়া কয়েকজন বিভ্রান্ত কর্মী কেন্দ্রের সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো। তাদের থেকেই জানা গেল—১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত পার্টির অভ্যন্তরে কি ঘটে যাচ্ছে—আর গিরি-প্রকাশ-দেবেন পলাশের হীন মুখোস উন্মোচিত হয়ে পড়ল।

এদিকে চার কুচক্রীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী সহকারী কম্যাণ্ডার নবায়ন ও উমুং (কেতু) ভিতরে ভিতরে নিজেদের অবস্থান শক্তি করতে লাগলো। চার কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত হবার পর নবায়ন ও উমং একটা সাধারন সভা আহ্বান করলো। সম্মেলনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো—

১) এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে এই সেক্টর পার্টির প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাওয়া ও অনুগত থাকা ;

২) এই অঞ্চলটা টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ;

৩) কেন্দ্রে অনতিবিলম্বেপ্রতিনিধি প্রেরণ করা ;

কিন্তু সভার কাজ শেষ হওয়ার পর পরেই 'প্রাবন' চক্রান্তকারীদের ডাক বয়ে আনলো। সেখানে গিরি, প্রকাশ, দীপায়ন (রোস্মি ও) ও সুমনের চিঠি আছে। চিঠিগুলি পেয়ে নবায়ন ও উমং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা ভুলে উপস্থিত কর্মীদেরকে ধোঁকা দিয়ে হিরো পুশকিন ও দীপঙ্করকে নিয়ে এক গোপন বৈঠক করে এবং এবারে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বানচাল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ফলে উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস ঘনীভূত হতে থাকে। অপরদিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী পুনরায় দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন প্রাক্তন শান্তি বাহিনীর চক্রান্তে ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উস্কানীতে স্থানীয় সমাজ বিরোধী ডাকাত প্রতিক্রিয়াশীলেরা কতিপয় সরল নীরিহ মুরুংকে পুনরায় বিভ্রান্ত করে আমাদের সাথে অনাকাঙ্খিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমাদের তরফ থেকে এসব প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কারসাজিতে ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সংকীর্ণ মানসিকতা ও সুবিধাবাদের কারণে এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতির খুবই অবনতি ঘটে। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এতে এলাকার জনগণ বড়ই হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। কর্মী বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠলো যখন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এম এন একদের সহ-যোগিতায় পার্টিও চাকমাদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে সংবদ্ধ হতে উস্কানী দিতে থাকে। আগুনে ঘৃতাহুতি দেবার মত রোস্মিও, সুমন, নবায়ন ও কেতুদের জনস্বার্থ পরিপন্থী অর্থনৈতিক দুর্নীতি জটিল পরিস্থিতি আরো জটিলতর করে ফেলে। তদুপরি এই এলাকা সীমান্ত-বর্তী ও অতিশয় অনুন্নত হবার কারণে এই অঞ্চলে দেশী-বিদেশী জনস্বার্থ পরিপন্থি এর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাই কিছু সংখ্যক সরল প্রাণ মুরুং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মিথ্যা সুযোগ সুবিধার আহ্বানে বিভ্রান্ত হয়ে জনস্বার্থ পরিপন্থী গংদের উস্কানীতেও কতিপয় প্রাক্তন শান্তিবাহিনীর সদস্যের নেতৃত্বে চাকমা ও মুরুংদের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করার ব্যর্থ অপচেষ্টা চালায়, অথচ ইহা অনস্বীকার্য যে এ যাবৎ এখানকার চাকমা মুরুং তথা দশভিন্ন ভাষা-ভাষি জাতিগুলো পরস্পরে এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থেকে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। এখানকার জুম্মদের মধ্যে মুরুংরাই প্রথমাবস্থা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রাম চালিয়ে নিতে জনসংহতি সমিতির সাথে সর্বাধিক সক্রিয়ভাবে সাহায্য সহযোগীতা দিয়ে এসেছে। অথচ আজ চার কুচক্রীর চক্রান্তে বিশেষতঃ রোস্মিও ও সুমনের ভ্রান্ত নীতিতে জুম্ম জাতিদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

রোজিও সুমন, নবায়ন ও কেতুর ভ্রান্তনীতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষের কারণে এই সেক্টর তথা সমিতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো। জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—তন্মধ্যে এই ঘাঁটি এলাকা রক্ষা করাও বিভ্রান্ত মুরুংদেরকে সমাজ বিরোধীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু চারকুচক্রীর চাটুকার নবায়ন ও উমং গৃহীত সিদ্ধান্ত পদদলিত করে নিজেদের ইচ্ছামত। হঠকারী পদক্ষেপ নিয়ে বিপথগামী মুরুংদের উপরে আক্রমণ করে বসে। এই আমক্রণে নিরীহ মুরুংরাও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জাতির কুলাঙ্গার নবায়ন ও উমং এর এই স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের ফলে সমগ্র সেক্টর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্য সফল হওয়াতে আরো সুপরিকল্পিত ভাবে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে পার্টির বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে থাকে। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় উপনীত হলো যে—আর ঘাঁটি এলাকা ধরে রাখা যাবেনা। তাই শেষ পর্যন্ত সর্ব দক্ষিণাঞ্চল সাময়িক কালের জন্য হলেও ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আমরা শেষ পর্যন্ত মূলবাহিনীর সাথে একত্রিত হলাম। কিন্তু আধা রাস্তা থেকে রোজিও সুমনের ন্যায় নবায়ন, উমং ও হিরো ইউনিটের প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা ও স্বর্ণ নিয়ে আমাদের থেকে সুকৌশলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যায়।

দেশ প্রেমিক বন্ধুগণ—আপনারা সবাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখুন সর্ব দক্ষিণাঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা পতনের (সাময়িক কালের জন্য হলেও) কে বা কারা দায়ী? আমরা যারা একই সেক্টরের কর্মী আমাদেরই এ বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ আমরা চারকুচক্রীদের একনিষ্ঠ সহযোগী রোজিও ও সুমনের হীন উদ্দেশ্যের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছি। আমাদের এই বিভ্রান্তি পার্টি তথা আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আমরা যা ভাবিনি, যা চায়নি তাই কার্যত হয়ে গেছে। যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল তজ্জন্য রোজিও সুমন, নবায়ন ও উমং—এই চার বিশ্বাসঘাতকই মূলতঃ দায়ী। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ-চক্রই সুরতন রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন দেখেছিল, মিথ্যার বেসাতি করে দেশী-বিদেশী গুপ্তচরদের খপ্পরে পড়ে শত শত কর্মীকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। জুম্ম জনগণের একাংশকে বিভ্রান্ত করেছে। দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতি যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একদিন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সামিল হয়েছে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিভ্রান্তি এনে দিয়েছে। ঘাঁটি এলাকা শত্রুর দখলে যেতে সুযোগ করে দিয়েছে। তাই দেশপ্রেমিক জনগণের উদ্দেশ্যে আমার একান্ত অনুরোধ—আর দ্বিধা নয়, সংশয় নয়,—দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতি একে অপরকে ঘৃনা না করে অতীতের সমস্ত তিক্ততা ভুলে গিয়ে, আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন জোরদার করে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্বের স্বার্থে আগের মতই সংগ্রামী চেতনায় উজ্জিবীত হোন, আসুন আমরা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র, জাতীয়বাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার—এই চার নীতির ভিত্তিতে 'মানবতাবাদের' পতাকাতলে একাত্মতা ঘোষণা করি। আসুন, অতীতের সকল তিক্ততা, বিভেদ, গ্লানি, হিংসা, ঘৃনা, নিন্দা সব ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রু বাংলাদেশ সরকারের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাই।

পরিশেষে সংগ্রামী দেশপ্রেমিক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ও আমার আহ্বান—আসুন, ভবিষ্যতে যাতে আমরা এমনিভাবে ভুল পথে পরিচালিত না হই তজ্জন্য রাজনৈতিকভাবে আরো সচেতন হই এবং পার্টির পতাকাতলে একাত্মতা ঘোষণা করে আগের মতই পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা ও উদ্যোগ নিয়ে শপথ গ্রহণ করি—আর দ্বিধা নয়, সংশয় নয়' আত্মসমর্পন নয়— পার্টি নির্দেশিত নীতিমালাগুলি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সমূলে উৎখাত করে জাতীয় কর্ণধার মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন জোরদার করে তুলি।

আজ ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৫ ইংরেজী। জাতীয় ইতিহাসে সব চেয়ে কলঙ্কিত স্মরণীয় দিন। এই দিনে জাতীর চেতনার অগ্রদূত ও পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এম এন লারমা ও অন্যান্য বিপ্লবী শহীদদের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-আন্দোলনে আপনার ভূমিকা

—শ্রী অলোপ

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ক্ষুদ্র দেশ। এই দেশে ভিন্ন ভাষা-ভাষি দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি স্মরনাতীত কাল থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাস করে আসছে। কালের চক্রে এসব শান্তিপ্রিয় সরল ও সহজ জীবনের অধিকারী জুম্ম জাতি আজ অবধারিত ধ্বংসের মুখোমুখী। এই ধ্বংস থেকে মুক্তিলাভ অর্থাৎ জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং ভিন্ন ভাষাভাষি দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুম্ম জাতির মধ্যে ভেদাভেদ বঞ্চনা ও শোষন অবসান করার উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রায় ছয় লক্ষ জুম্ম জাতির প্রত্যেক নরনারী কোন না কোন ভাবে এ আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেনি। কারণ আপেক্ষিকতার কারণে মানুষ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। যেহেতু অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামই হচ্ছে জীবের সাধারণ ধর্ম। এজন্য মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য স্মরনাতীত কাল থেকে যুগে যুগে দেশে দেশে সময়ে নিয়মতান্ত্রিক, আরেক সময়ে অনিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ সশস্ত্রভাবে বাস্তবতার আলোকে অস্তিত্ব ধ্বংস কারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে যে যাই হোক না কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেক নরনারী অবশ্যই মনে প্রাণে কামনা করে সম্মানজনকভাবে এ রক্তাক্ত সংগ্রাম (আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকার) এর অবসান হোক। তাই দীর্ঘ এক যুগ সংগ্রামের পরে আজ সমগ্র জুম্ম জাতির মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা। যেমন আমাদের এত দুঃখ দুর্দশা কেন? কেন এত নির্যাতন নিপীড়ন? বাংলাদেশ সরকার স্বায়ত্ব শাসনের দাবী পূরণ করে দেবে কি দেবে না? বিভেদ পন্থীরা শত্রুর কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে কি লাভ হলো? বার বছরের সংগ্রামে আমরা কি পেলাম? জনসংহতি সমিতির বর্তমান অবস্থা কেমন? মানবেন্দ্র লারমা আর নেই, সন্তু লারমা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে কিনা? জুম্ম জাতির ভবিষ্যৎ কি হবে—এমনিতর শত জিজ্ঞাসা আজ ঘরে বাইরে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

উপরোক্ত জিজ্ঞাসার উপর কোন পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন করার আগে মনে হয় অতীতের দিকে একটু তাকানো দরকার। এটা কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একদিন স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৭৮৭ সালে কতিপয় প্রভাবশালী অভিজাতের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাধীনতার যে বীজ রোপিত হয় তা ফলে ফুলে পাকাপোক্ত হয়ে উঠে ১৮৬০ সালে। তারপর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলো। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ চিরদিনের মত ভারত ছেড়ে চলে গেল। মুসলমানের আবাস ভূমি পাকিস্তান আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সমূহ সহ অন্যান্য অমুসলমানদের আবাস ভূমি ভারত এই দুই রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। Bengal Boundary Award Commission এর কারসাজি, তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদাসীনতা আর এদেশের জাতীয় নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও সংকীর্ণতার কারণে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলমানের আবাসভূমি পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ফলতঃ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বিদায় নিলেও সামন্ত উপনিবেশিক শাসনের করাল গ্রাস থেকে জুম্ম জনগণ মুক্তি পেল না।

বরঞ্চ শুরু হলো আরেক নূতন অধ্যায়। জন্মলগ্ন থেকে স্বৈরাচারী উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার জুম্ম জনগনের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশ করণ, স্থানীয় জুম্মদেরকে বঞ্চিত করে ব্যবসা বাণিজ্য ও প্রশাসনে সমতল ভূমি লোকদেরকে একচেটিয়া অধিকার প্রদান, কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া, মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা করা এবং ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্বের আইন বাতিল করার মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটাতে থাকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো। পাকিস্তান যা সমাপ্ত করতে পারেনি, তাই সমাপ্ত করতে উঠে জাত্যাভিমানী বাংলাদেশ সরকার উঠে পড়ে লেগে গেল; ফলে বাংলাদেশ জন্মের পর পরই জুম্ম জনগনের সমস্ত প্রকারের আবেদন নিবেদন ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে জুম্ম জনগণের পৃথক অস্তিত্বের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হলো না— জুম্ম জনগণকে বাঙ্গালী করে তথাকথিত জাতিত্বের উন্নতি ঘটানো হলো। সাথে সাথে শুরু হয় পোড়া মাটি নীতি প্রয়োগের পালা। তথাকথিত বৈদেশিক আক্রমনের দোহাই দিয়ে দীঘি নালা, রুমা ও লামার আলিকদমে তিনটি

সেনানিবাস রাতারাতি স্থাপন করা হয়ে থাকে। বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে, জেল-জুলুম, ধরপাকড়, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, মারপিট, লুটপাট, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া জুম্ম জনগণের নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে উঠল। অথচ বাংলাদেশে বারবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও জুম্ম জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হলো না। বরঞ্চ এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে জুম্ম জনগণের উপরে অত্যাচারের মাত্রা যেমনি বেড়ে যেতে থাকে তেমনি জাতীয় অস্তিত্বের বিলুপ্তির আরো নব নব নীতি ও কৌশল প্রয়োগ হতে থাকে। যেমন তথাকথিত যৌথ গ্রাম ও আদর্শ গ্রামের পরিকল্পনা যা জুম্ম জনগনকে পাইকারীভাবে কারারুদ্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়, জাতীয় বেঈমান 'তুলা' (সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল) দের মাধ্যমে উপজাতীয় সম্মেলন গঠন করে আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করা হতে থাকে; দিনের পর দিন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কম্বিং অপারেশনে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সামরিক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। যখন সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে তখন সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ করানোর উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শুরু হলো হাজার হাজার বাঙ্গালী মুসলমানের বেআইনী অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল। সর্বোপরি অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করানো হতে থাকে। সেই সাথে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার হীন কর্মসূচীও চলতে থাকে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চিরতরে ভেঙ্গে দিতে সরকার মরিয়া হয়ে উঠে। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতিও সচেতন জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে বছরের পর বছর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। অসম দুই বিপরীত শক্তি আজ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে— আজ কোন পক্ষের একতরফা ভাবে হাল ছেড়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠেনা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার যেহেতু অধিকার প্রদানকারী শক্তি, যেহেতু জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রাম হচ্ছে একটা ন্যায়সংগত সংগ্রাম, সেহেতু সর্বাগ্রে বাংলাদেশ সরকারেরই উচিত এগিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করে সব অচলাবস্থার অবসান করা। কিন্তু উগ্র ধর্মান্ধ সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার চায় অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করতে।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব সমাজ, চাষী, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী তথা আপামর জুম্ম নরনারী এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। এজন্য আপনার ও অনেকের মনে প্রতিনিয়ত হাজারো জিজ্ঞাসা জাগছে আর সে সব জিজ্ঞাসার সমাধান দেখতে না পেয়ে কতোই না হতাশা নিরাশা, ও যন্ত্রণায় ভুগছেন; কিন্তু কোনদিন ও কি আত্ম জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন এই যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—এটার জন্য আপনি কি করেছেন? হয়তো বা চিন্তা করে দেখেছেন কিন্তু কার্যত এই চিন্তার প্রতিফলন কিভাবে ঘটিয়েছেন বা ঘটাতে চান সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিচার্য বিষয়। সুদূর ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবদি জাতীয় পর্যায়ে শাসন শোষণের যে সংক্ষিপ্ত রূপ একটু আগে তুলে ধরেছি তাতে নিশ্চয়ই আপনি দ্বিমত পোষণ করবেন না। একদিকে জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অপরদিকে অস্তিত্ব রক্ষার আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রাম এই দুইএর টানা পোড়নে আপনার মনে যেমনি হাজারো জিজ্ঞাসা তেমনি আমার মনেও; কিন্তু একটা বিষয়— যা সকল জিজ্ঞাসার সরল সমাধান দিতে সক্ষম অথচ আমি, আপনি তথা প্রত্যেকেই সেই বিষয়টুকু খুবই সচেতন ভাবে এড়িয়ে চলি। সেটা হচ্ছে— আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে নিজের ভূমিকা কি? সুতরাং আপনাদের হাজারো জিজ্ঞাসার মধ্যে আমার একটিমাত্র জিজ্ঞাসা তা হচ্ছে— জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্ম ভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে আপনি বিগত বারোটা বছরে কি ভূমিকা পালন করেছেন?

সবাই বলছি আমরা চরম দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ ও অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত। এর জন্য কে দায়ী? কেউ বলছেন— বাংলাদেশ সরকারই এর জন্য দায়ী। আবার কেউ বলছেন জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু না করলে আমাদের এই অবস্থা হতোনা; আবার কেউবা বলছেন— আমাদের আগের জাতীয় নেতৃত্বই এর জন্য দায়ী; সর্বোপরি কেউ কেউ অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বলে থাকেন— আগের জন্মের কর্মফলই দায়ী এভাবে নিজ নিজ চিন্তাধারার আলোকে আমরা আজকের দুর্বিষহ জীবনের কারণ খুঁজতে প্রয়াসী হই। কিন্তু সব কথারই একটা কথা শুধু বলতে চায় যে সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন ও উগ্র ধর্মান্ধ বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদের ধারক বাহক বাংলাদেশ সরকারই সমস্ত দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী। অবশ্য যারা দুনিয়াটাকে রঙীন চশমার চোখে দেখতে চায় অথবা যারা শাসক গোষ্ঠির পা-চাটা দালাল তাদের কথা অবশ্যই আলাদা।

এবার দৃষ্টি দেয়া যাক— জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের সবাই এর ভূমিকা সম্পর্কে। আমরা জানি বাংলাদেশ সরকার আজ জুম্ম জনগণের সাথে এক অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা প্রত্যেকেই এই যুদ্ধে হয় জুম্ম জনগণের পক্ষে নয়তো বিপক্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। বলা বাহুল্য সমাজে "তুলারা" অবশ্যই বরাবরই সরকারের লেজুরে ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছে। সে যাক, প্রথমেই জাতিগতভাবে বিষয়টা তলিয়ে দেখি। পার্বত্য চট্টগ্রাম দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাস ভূমি।

স্মরণাতীত কাল থেকে পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে এই দশ জাতি একে অপরের সুখে দুঃখে ভাগীদার হয়ে আসছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের পদার্পণের পর থেকেই এই সরল ও সহজ জীবনের অধিকারী জুম্ম জাতির মধ্যে দেখা দিল ভেদাভেদ, শোষণ ও বঞ্চনা। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের ভাগ করা ও শাসন করার নীতিই হলো এটার মূল কারণ। বৃটিশ চলে গেল— রেখে গেল তার এই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিই। তারপর পাকিস্তান একই নীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন শোষণ করে গেল। এর পরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শাসন অনুসরণ করে এই হীন নীতির আধুনিক রূপ দান করে। দশ ভাষাভাষি জুম্ম জাতির উপর আরো নগ্ন ভাবে এই হীন নীতি প্রয়োগ করতে থাকে। তাইতো আজ জুম্ম জাতির মধ্যে এত সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভেদাভেদ এত প্রখর হয়ে উঠেছে। মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে জুম্ম জাতি মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্ম ভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই জুম্ম জাতি আজ এই সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ নীতির শিকারে পরিণত হয়েছে এবং এই বিভেদ নীতি তাদের সরল, সহজ ও নিস্তরঙ্গ জীবনে এনে দিতে উদ্যত হয়েছে— পরস্পরে হানাহানি ও দলাদলি। এটা কিন্তু কোন দিনই শুভ হতে পারে না। সম্প্রসারণবাদী সরকার দিনের পর দিন সুপরিকল্পিতভাবে জুম্ম জাতির মধ্যে ফাটল ধরানোর ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে এদেশের দুলাদেরকে স্বার্থকভাবে ব্যবহার করে সরকারের হীন অপপ্রয়াস দিন দিনই জাতীয় স্বার্থের পরিহানি ঘটাচ্ছে। এদের মাধ্যমে সরকার অপপ্রচার চালাচ্ছে—জনসংহতি সমিতি শুধুমাত্র চাকমা জাতির পার্টি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেলে চাকমারাই সব সুবিধা ভোগ করবে। পার্টি যদি সব জুম্ম জাতিরই স্বার্থ চিন্তা করে থা... তাহলে মারমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য জুম্ম জাতি থেকে নেতা নেই কেন?—ইত্যাদি অবান্তর কথার অপপ্রচার চালিয়ে জন সংহতি সমিতিকে মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, খেয়াং, পাংখো, খুমী, চাক ও লুসাই জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে; অপরদিকে মারমা ও ত্রিপুরা জাতির উন্নয়নের নামে মারমা, উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ গঠন করে দিয়ে এবং এইসব সংগঠনগুলোর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে সংখ্যাধিক্য মারমা ও ত্রিপুরা জাতিকে চাকমা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৃত্রিম প্রাচীর রচনা করে পশ্চাৎভাগ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে ছুরিকাঘাত করে চলেছে। অতি সাম্প্রতিককালে খাগড়াছড়িস্থ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৩০ বেঙ্গলের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল নিয়াজ এবং একই ইউনিটের মেজর আখতার চাকমাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা ও মারমাদেরকে উত্তেজিত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। অবশ্য মারমা ও ত্রিপুরার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই অপচেষ্টা দৃঢ়তার সাথে বিরোধীতা করেন। সর্বোপরি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে দক্ষিণাঞ্চলে সংখ্যাধিক্য মুরুং জাতিকে, স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের মাধ্যমে সন্দেহ ও বিশ্বাস এনে দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন ও চাকমা জাতির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে—তাছাড়া সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমনি বিভেদনীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, অনুরূপ জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন তথা দমননীতি প্রয়োগ করার সময়েও এই জঘন্য নীতি স্বার্থকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে সাধারণ জুম্মদের মধ্যে চরমভাবে মানসিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আর সামরিক জান্তা এরই মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের সাথে জুম্ম জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার যথাসাধ্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইহাও বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে—সরকারের এই বিভেদ নীতির ফলেই গিরি-প্রকাশ দেবেন—পলাশ চক্র সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে চরম আঘাত হানতে চেষ্টা করে; বলাই বাহুল্য এই গৃহযুদ্ধে দুলা বাহিনীকে সরকার সার্থকভাবে লেলিয়ে দিতে সমর্থ হয়। আর এসব ক্ষেত্রেও সরকারের ভাড়াটে 'দুলারা' স্বার্থক মীরজাফরী ভূমিকা পালন করে। অথচ আপনি ও ভালভাবে জানেন যে—দশ ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুম্ম জাতি মনে প্রাণে স্বপ্ন দেখে সুখে দুঃখে ভাগী ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী জুম্ম জাতির। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রাম শুরু করেছে। বলাই বাহুল্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে জন সংহতি সমিতি সুখী ও সমৃদ্ধশালী এক ঐক্যবদ্ধ জুম্ম জাতি প্রতিষ্ঠা করতে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আপনি জানেন জনসংহতি সমিতি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে আসছে যে—পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতি যদি সক্রিয়ভাবে এই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে না থাকতো, তাহলে সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়া তো দূরের কথা জনসংহতি সমিতিও গঠন করা সম্ভবপর হতো না। এদেশের অশিক্ষিত, অনুন্নত গরীব জুম্মরা জাতির কর্ণধার মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার আহবানে সাড়া দিয়ে সামন্ত ঔপনিবেশিক ও উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে—এটা বাস্তব সত্য। তাই দেশে বিদেশে জুম্ম জনগণের এই সংগ্রাম যে তাদেরই বাঁচা মরার সংগ্রাম তা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। শুধু চাকমারাই নয় এদেশের মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম তথা সকল জুম্ম জাতিই এই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের মহান কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। প্রত্যেকটি জুম্ম জাতির ত্যাগ তিতিক্ষা, সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার কারণেই সুদীর্ঘ বারো বছরের পরে ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন

সজীব ও দুর্বার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে গৃহযুদ্ধ বাংলাদেশ সরকারের বিভেদনীতিরই একমাত্র ফসল। দেশী বিদেশী গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালের খপ্পরে পড়ে নিজেদের ক্ষমতার উচ্চ বিলাস চরিতার্থের জন্য গিরি প্রকাশ দেবেন-পলাশ চক্র উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করেছিল। এই গৃহযুদ্ধের ফলে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির অপুরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিভেদ নীতির ধারক বাহক বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জাতি সমূহের মধ্যে আরো ভেদাভেদ রেষারেষি ও দলাদলি আনয়নে অনেক সুযোগ পেয়ে থাকে।

ভেবে দেখুন, আজ জুম্মজাতির মধ্যে যেটুকু ভেদাভেদ, বিদ্বেষ, ও দলাদলি হয়েছে তা কিভাবে কি উদ্দেশ্যে ও কার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ সরকারই জুম্ম জনগণের বাঁচা মরার সংগ্রাম নস্তাৎ করে দেওয়ার জন্য জুম্ম জনগণদের মধ্যে বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও অবিশ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর আমাদের জাতীয় বেঈমান, পা চাটা কুকুর— 'দুলা বাহিনী' বাংলাদেশ সরকারের এই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মদত দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ আমাদের নূতন করে ভাববার দিন এসেছে। জাতিগতভাবে ইতিমধ্যে আমাদের উপর অনেক ঝড় বয়ে গেছে। আমরা আজ অনেক দিক দিয়েই যেমনি ক্ষত বিক্ষত তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ। বাংলাদেশ সরকার ও তার লেজুরেরা যা চায় সেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নস্তাৎ করে দেয়ার হীন ষড়যন্ত্র অবশ্যই সংগঠিত ভাবে সমগ্র জুম্ম জনগণকে মোকাবিলা করতে হবে। "বিভেদ কর ও শাসন কর"— এই হীন নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র জুম্ম জাতিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জন করে আরো অধিক পরিমানে সংগঠিত হতে হবে অন্যথায় সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প সমগ্র জাতিকে অবশ্যই এক অনিশ্চিতের দিকে ঠেলে দিয়ে জুম্ম জাতির ধ্বংস অনিবার্য করে ফেলবে। তাই সমগ্র জুম্ম জনগণের মধ্যে জাতিগতভাবে যদি কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তাহলে আসুন আমরা সমষ্টিগত ভাবে সেই অশুভ মনোভাব উৎখাত করি। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে এই মুহূর্তে এক দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমগ্র জুম্ম জনগণকে আরো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ এবং অপরদিকে সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের বিভেদের মাধ্যমে শাসন করার হীন নীতির সমুচিত মোকাবিলা করাই দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির আজ মুখ্য ভূমিকা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ— আমরা সকলেই জানি জুম্ম সমাজে নানা শ্রেণীর লোকের বসবাস। শ্রেণীগত ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সমাজে সংখ্যাধিক্য। পেশাগত ভাবে চাষী, বুদ্ধিজীবি, চাকুরীজীবি ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবি, শ্রমিক ও ছাত্রদের নিয়েই মূলতঃ আমাদের সমাজ। সামন্ত অর্থনীতির কারণে জুম্ম সমাজে শিল্পপতি বা ধনীর উপস্থিতি নেই। তবে লক্ষণীয় বিষয় যে সর্বস্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ধ্যান ধারণার প্রভাব বিদ্যমান। সমাজে নিজ নিজ ক্ষেত্রেই অবস্থান করলেও প্রত্যেকেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত না হয়ে পারেনি। এজন্য জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পেশা তথা শ্রেণীগতভাবে জুম্ম জনগণের ভূমিকাও সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ সমাজে যারা ভূমিহীন, অতি গরীব ও শ্রমিক, তাদের উপস্থিতি ও ভূমিকার উপরই আন্দোলনে জয় পরাজয় মূলতঃ নির্ভর করে থাকে, যারা মধ্যবিত্ত তারা সন্দেহ পরায়ন তাই আন্দোলনে তাদের উপস্থিতি ও ভূমিকা প্রায় ক্ষেত্রে ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত। আর যারা সামন্ত, ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সাধারণতঃ তারা আন্দোলনের বিরোধীতা করে অথবা সরকারের লেজুর হয়ে থাকে। বলাই বাহুল্য আমাদের জুম্ম সমাজে ও এর প্রতিচ্ছবি মোটামুটিভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে, ইহা সুস্পষ্ট যে—চাষী, বুদ্ধিজীবি, চাকুরীজীবি, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক-যুবতী তথা আপামর জনগণের কারোর জীবনের নিশ্চয়তা নেই। আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করেন প্রত্যেকে এক সামরিক সন্ত্রাস ও অরাজকতার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই প্রতিনিয়তঃ সকলের চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে অভাবনীয় ধ্বংসলীলা। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়নে আজ নাৎসী বাহিনীর হিংস্রতা ও বর্বরতাকেই ছাড়িয়ে গেছে। আপনার সামনে আপনার বাবা-মাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে; স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। স্বীয় কন্যার সাথে পিতাকে ধর্ষণ করতে বাধ্য করাচ্ছে, মা-বাবার সামনে তাদের যুবতী কন্যাকে পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে; চোখের সামনে আপনার সমস্ত ধন সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে; মিথ্যা অজুহাতে আপনাকে, আপনার সন্তান সন্ততিকে অত্যাচার করছে, নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করছে, কারাগারে নিক্ষেপ করছে, আপনার চোখের সামনেই ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আপনাকে সারা জীবনের মত পঙ্গু করে ছেড়ে দিচ্ছে, চোখের সামনে আপনার প্রিয়জনকে গুলি করে হত্যা করছে, সর্বত্র উপহাস ও বিদ্রুপের মুখোমুখি হচ্ছেন, ষড়যন্ত্র করে মূল্যবান ফাইনাল পরীক্ষা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, চরম অপমানের মধ্যে চাকুরী করছেন, মাথানত ও তোষামোদী করে ব্যবসা করছেন, বাজারে জিনিষ বিক্রয় করছেন সস্তা দামে, পক্ষান্তরে জিনিষ কিনতে হচ্ছে বেশী দামে, আপনি বেকার অথচ চাকুরীর আবেদন করলে শান্তিবাহিনী হিসাবে অপবাদ পাচ্ছেন, দেখতে দেখতে হাজার হাজার বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ কারীরা মিথ্যা অজুহাত তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করছে, আপনার প্রাপ্য সাহায্য বিতরণ করে দেয়া হচ্ছে, আপনাকে ইসলাম

ধর্মে দীক্ষিত করার ষড়যন্ত্র করছে, চোখের সামনে আপনার যুবতী কন্যা ও বোনকে ফাঁদে ফেলে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, ধর্মীয় সভা করছেন আপনার ও অন্যান্যদের উপর অবাধে গুলিবর্ষণ করা হচ্ছে, আপনার পরম পিতামাতা অথবা আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করছেন তা আপনার সামনেই লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে, জরুরী কাজে অথবা আত্মীয়স্বজনের দুঃসংবাদে কোথাও যাচ্ছেন আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অস্ত্রের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, পক্ষান্তরে সরকারের দালালী করছেন, জুয়া খেলছেন, মদ খাচ্ছেন, ইনফরমার গিরি করছেন, সশস্ত্র বাহিনীতে জুম্ম নারী উপহার দিচ্ছেন, সমাজে দুর্নীতি করছেন, ইসলাম ধর্মের প্রশংসা করছেন, বাঙ্গালী মুসলমানদের আচার আচরণ গ্রহণ করছেন, বাংলা ভাষায় কথা বলছেন—স্বপ্ন দেখছেন শান্তি বাহিনীর চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছেন, জনসংহতি সমিতির ধ্বংস কামনা করছেন, সরকারী নীতি ও কৌশল যথার্থই বলে প্রশংসা করছেন, পরমাত্মীয় হয়ে তাদেরকে আলিঙ্গন করছেন, নিজের স্ত্রীকে পরম প্রভুভক্তের মতো উৎসর্গ করছেন, নিজের যুবতী কন্যাকে অবাধে মেলামেশা করার জন্য সুযোগ দিচ্ছেন; সরকারী নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন; একান্ত বাধ্যগতের মত সব অপমান নিরুপ, লাঞ্ছনা সহ্য করছেন, যাই হুকুম করে তাই কোরাণ হদিস বলে মেনে নিচ্ছেন—তাহলে আপনি বাহবা পাচ্ছেন, হালুয়া রুটির উচ্ছিষ্ট থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না আর তথা কথিত নিরাপদ জীবন যাপনে অনুমতি পাচ্ছেন। এইতো হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতিতে আপনি একজন চাষী। আপনি জুম চাষী হউন আর ভূঁই চাষী হউন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি নিশ্চিন্তে চাষ করতে পারছেন? মোটেই না। আপনার মনে অহরহ একটিই দুশ্চিন্তা যে কখন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা এসে আপনাকে মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তার করে মারধর করে, আপনার স্ত্রী যুবতী কন্যা অথবা আপনার মা বোনকে দাবী করে বসে। রাতের অন্ধকারে কখন আপনার ঘর ঘেরাও করে, শত অত্যাচার ও লুটপাট করে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। তাছাড়া বাজারে গেলে ও কিছু বেশী পরিমাণের জিনিস কিনলে শান্তি বাহিনীর যোগাযোগকারী বলে আপনাকে গ্রেপ্তার বা অপমানিত নির্যাতীত হওয়ার প্রতি পদে পদে সম্ভাবনা। আপনার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে হয় জলের দামে পক্ষান্তরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। আপনার ছেলে অথবা ভাই কলেজে পড়াশুনা করছে তা সত্বেও আপনাকে সন্দেহ করা হচ্ছে—আপনি একজন জনসংহতি সমিতির সক্রিয় সমর্থক ও সাহায্যকারী ঘরে বাইরে সর্বত্রই আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন।

আপনি একজন ছাত্র। আপনি কলেজ, বিদ্যালয় অথবা কোন টেকনিক্যাল লাইনে পড়াশুনা করছেন। বয়সের দিক দিয়ে আপনি তরুণ ও প্রাণোচ্ছল। লেখাপড়া করছেন—ভবিষ্যতের স্বপ্ন উচ্চ শিক্ষা নেবেন, ঘর বাঁধবেন—সুখে জীবন কাটাবেন। কিন্তু আপনি কখনও গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন কি—আপনার জীবনটা পুরোপুরি অনিশ্চয়তায় ভরা? আপনার চতুর্দিকে তো অনাকাঙ্খিত মানুষের আনাগোনা। আপনি শহর বন্দরে থাকেন—আপনার দেশবাসী থেকে অনেক দূরে। কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয় যে—আপনারই অতি প্রিয়জনেরা কিভাবে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। আপনি পড়ছেন বটে— কিন্তু সরকার আপনাকেও সন্দেহ করছে। প্রয়োজনে আপনাকে জেরা করছে, মারধর করছে, গ্রেপ্তার করছে, জেলে পুরছে এমন কি হত্যাও করছে। যে কোন সময়ে আপনাকে সরকার মিথ্যা অজুহাতে যা কিছু করতে পারে। বাজারে যান, ক্লাশে যান, রাস্তাঘাটে ঘুরেন—যেখানে যান না কেন সর্বত্রই আপনাকে সন্দেহ ও আক্রোশের চোখে দেখা হচ্ছে। যেখানে আপনার জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্ম ভূমির অস্তিত্ব টিকছেনা, সেখানে আপনার উচ্চ শিক্ষা তথা ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন যে অর্থহীন তা ভেবে দেখছেন কি?

ধরুন আপনি যুবক। আপনি যদি শিক্ষিত বেকার যুবক হোন তাহলে আপনি বেকারত্ব জীবন নিয়ে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছেন। চেষ্টা করছেন একটা চাকুরীর জন্য অথবা একটা ব্যবসা চালাতে। কিন্তু কোনটাই হচ্ছে না। আপনি যদি গ্রামাঞ্চলে থাকেন। চাষাবাদ করছেন আপন মনে। ভাবছেন এভাবে আপনার জীবন এগিয়ে যাবে। কিন্তু সরকারের লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র বাহিনী যে আপনার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তা নিশ্চই আপনার অজানা নয়। যে কোন মুহূর্তে আপনাকে পার্টির শাখা, আপনাকে পার্টির সাথে জড়িত করে নানা ভাবে অত্যাচার এমন কি মেরেও ফেলতে পারে। বলা বাহুল্য এ ধরণের ঘটনা আজ পর্যন্ত অনেক অনেক ঘটে গেছে। আপনি যুবক। সকাল বেলার সূর্যের মতোই আপনার তেজোদীপ্ত হৃদয়। সুতরাং আপনার এই অনিশ্চিত জীবন সম্পর্কে কি কোনদিন গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছেন?

আপনি একজন নারী। পুরুষ শাসিত সমাজ। নেই গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায় বিচার। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর চোখে আপনি যে শুধুমাত্র ভোগ্য সামগ্রীর মতো তা নিশ্চয়ই বার বার ভেবে দেখেছেন— আপনি বিবাহিতা হোন আর অবিবাহিতা হোন—আপনার দেহের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর লালসা অফুরন্ত। আর বাস্তবতঃ এজন্য এদেশের শত শত জুম্ম নারী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পাশবিক শিকারে পরিণত হচ্ছেন। অনেককে জোর করে অথবা ফাঁদে ফেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করছে। শুধু তাই নয় আপনার শালীনতা হরণ করা হচ্ছে, রাতের উথলে এসে ঘর ঘেরাও করে আপনার উপর অশালীন ব্যবহার ও নানা অত্যাচার

করে যাচ্ছে। আপনার ছেলে বা স্বামী পার্টিতে গেছে এই অজুহাতেও আপনাকে দৈহিক নির্যাতন করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই আপনি এ অবস্থার পরিবর্তন চান। অথচ আজ আপনার কোথাও নিরাপত্তা নেই। সুতরাং এই প্রকারের অনিশ্চিত অবস্থায় কিভাবে জীবন কাটাবেন নিশ্চয়ই আপনি ভাবছেন?

যারা বুদ্ধিজীবি ও চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ী তারা নিশ্চয়ই ভাবেন যে—আমার কি অসুবিধা? ভাবছেন—বুদ্ধি দিয়ে অথবা চাকুরী করে অথবা ব্যবসা নিয়ে আমি বেশ ভালই আছি। সন্তানদের লেখাপড়া করাচ্ছি কিংবা শিক্ষা শেষ করে সন্তানের চাকুরী, ব্যবসা বা অন্য কিছু করে নিয়ে নিচ্ছে। দেশ জাত চুলোয় যাক—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। বস্তুতঃ এটা কি আপনার মনেরই কথা? না অবশ্য মনকে নিজে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আপনার মনে এই ভাবনা অথবা শত্রু বাংলাদেশ সরকারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আপনার এই আচরণ? অবশ্যই এটা আপনার মনের কথা হতে পারে না। আপনি শিক্ষিত সমাজের সম্মানিত একজন। আপনার চোখেরই সামনে উগ্র ধর্মান্ধ বাঙ্গালী সম্প্রসারণবাদ যে ভাবে তার হীন নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে, তাতে আপনার অস্তিত্বের জন্য নিশ্চয়ই আপনি চিন্তা না করে পারেন না। আমি বিশ্বাস করি—আপনি ভিতরে ভিতরে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছেন; কিন্তু বুকে এমন সাহস নেই যে সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন? আপনার দেশ প্রেম সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ গৃহযুদ্ধের সময়ে আপনি কতোই না হিতোপদেশ দিয়ে আন্দোলনকে বাঁচাতে চেয়েছেন। এমনকি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের জন্য গা বাঁচিয়ে সাহায্য ও করে চলেছেন। কিন্তু একি যথেষ্ট? আপনার মতো শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের যে একান্ত প্রয়োজন তা কি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন নি? অথচ পথে ঘাটে অফিস আদালতে নিজের ব্যক্তিত্ব ধুলায় বিলুণ্ঠিত হচ্ছে। আপনার অতি আপন জনেরা—দেশবাসীরা বছরের পর বছর সীমাহীন নিপীড়ন, নির্যাতন ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম চলছে; এটা আপনি স্বীকার করেন তবুও আপনার মনে এত দ্বিধা ও সংশয় কেন?

আপনি একজন 'তুলা' (প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী)। সমাজে আপনি একজন অতি ঘৃণিত ব্যক্তি। তবে শত্রুর কাছে আপনি পরম আত্মীয়ের মত। আপনি মনে করেন যে—"আর কি চাই—দেশদ্রোহী জনসংহতি সমিতির ধ্বংস কামনায় আমি দেশ প্রেমের (তথাকথিত) শীর্ষে অবস্থান করছি। আমি সরকারের প্রিয় পাত্র। ভাবছেন দালালী করে শান্তিবাহিনী ক্যাম্প দেখিয়ে দিয়ে পার্টি কর্মী ও কর্মী পরিবারের সদস্যদের ধরিয়ে দিয়ে, স্বজাতি মা-বোনদেরকে মুসলমানের হাতে তুলে দিয়ে, সমাজে দুর্নীতি করে, জুম্ম জনগণের ঐক্য যাতে ভেঙ্গে পড়ে সেভাবে ষড়যন্ত্র করে আজ পাকা দালান করছি, সন্তানদের পড়াচ্ছি, প্রিয়ার মুখে হাসি ফোটাচ্ছি কিংবা দু'হাতে পয়সা উড়াচ্ছি, ব্যক্তি আক্রোশ মিটাচ্ছি। ইউনিয়ন ও উপ-জিলার চেয়ারম্যান হচ্ছি; রাতারাতি তথাকথিত জুম্ম নেতা বনে যাচ্ছি—আমার অভাব কিসের?" আপনার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কিন্তু আমার একটা বলার আছে। তা হচ্ছে—তুলা হিসেবে যাই করেন না কেন, আপনি কোনদিন ভেবেছেন কি যা করছেন তার পরিণতি কি হবে? বলবেন—ছাই হবে, "জনসংহতি সমিতি কোন দিনই বিজয় অর্জন করতে পারবেনা। সর্বোপরি আমি সশস্ত্র বাহিনীর নেক নজরে আছি, সুতরাং এত নিরাপত্তার মধ্যে আমায় কে কি করতে পারে?" বলা বাহুল্য যে—আপনি যাদের আশ্রয়ে এত লাফালাফি করছেন তারা যে পোষা কুকুরের মতো আপনাকে দেখে থাকে তা একটি বারও ভেবে দেখেছেন কি? আজ আপনি অনেক কিছুই করছেন কিন্তু এমন একদিন আসতে পারে যেদিন আপনাকে আপনার তথাকথিত মিত্র (প্রভু) আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে—এ কথাও কি কোনদিন ভেবেছেন? হতে পারেন আপনি আজ শত্রু পক্ষের পরম মিত্র তবুও আপনাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করি যে সত্যিই কি আপনি আপনার জন্মভূমি এবং নির্যাতীত ও বঞ্চিত জুম্ম জাতিকে ভালবাসেন না? এই যে সশস্ত্র বাহিনী এত অত্যাচার করছে এর জন্য একটুও বিচলিত হয়ে পড়েন না? জুম্ম জনগণকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বাংলাদেশ সরকার যে জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিচ্ছে তাকি কোন সময়েই চিন্তা করে দেখেন না? আপনার চিন্তা, আপনার কার্যকলাপ যে স্বজাতি ও স্বদেশের সর্বনাশা সাধন করছে একটুও উপলব্ধি করতে পারেন না?

আপনি একজন প্রাক্তন শান্তি বাহিনী তথা পার্টির সদস্য। আন্দোলনের গতিধারার সাথে তাল মিলাতে না পেরে আপনি নিষ্ক্রীয় হয়ে গেছেন অথবা গৃহযুদ্ধের সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে সশস্ত্র বা নিরস্ত্রভাবে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন; বিনিময়ে শত্রু আপনাদের দয়ার অবতার সেজে কিছু অর্থ কিংবা ধোঁকা দিয়ে কয়েকজনকে পুনর্বাসন দিয়েছে। জাতীয় স্বার্থটা প্রাধান্য না দিয়ে এই যে আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন—এ জন্য কি আপনাদের একটুও অনুতাপ হয় না? একটুও কি বিচলিত হয়ে পড়েন না? যে অস্ত্র গোলাবারুদ জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসকারী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও তার লেজুরদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার কথা, সে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আপনার দেশবাসীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে—তজ্জন্য আপনার মনে কি একটুও প্রতিক্রিয়া হয়না? আপনি যে দেশ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন এজন্য একটুও কি আপনার বিবেকে প্রশ্ন জাগে না? আপনি চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করছেন, শান্তি বাহিনীর ক্যাম্প দেখিয়ে দিচ্ছেন, কয়েকটা টাকার বিনিময়ে শত্রুর দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দো-

লনে আঘাত হানছেন—এসব কিছুর পরিণাম কি হবে তা কি একটুও ভেবে দেখেন না? মানুষ ভুল করে। ভুল করাটা সহজ। ভুল সংশোধন করাটাই বড় কথা। তবুও জুম্মজাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্বের স্বার্থে আপনার ভুল সংশোধন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। জনসংহতি সমিতি তথা আপামর জনগণ তাই কি আপনার থেকে আশা করতে পারে না? পরিশেষে জিজ্ঞাসা করি—সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এত কিছুই করে দিচ্ছেন তবুও কি আপনি সরকারের কাছে বিশ্বস্ত ও আপন হতে পেরেছেন?

আপনি চাকুরী, ব্যবসা ও চাষ করে সুখে দিন কাটাচ্ছেন। আপনি নিজেকে মনে করেন যে—সরকারের কাছে অতি বিশ্বস্ত পাত্র। স্ত্রী-পুত্র কন্যাসহ আরামেই ঘর সংসার করছেন। এজন্য আমার কোন হিংসা নেই। তবে, প্রশ্ন জাগে—যে জীবন কাটাচ্ছেন সেটা কি সত্যিই ইতরের নয়? উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একটা সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে আপনি লেখাপড়া করছেন নিশ্চিন্তে। সরকারের উচ্ছিষ্ট খেয়ে আপনি জঘন্য আত্মসমর্পিত পরাহত জীবন নিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ আপনাদের সকলের ভাবখানা যেন মনের মধ্যে কোন দুঃখ নেই, জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। কিন্তু যখন শান্তি বাহিনীর সফলতার কথা শুনেন তখন কেন আপনার মন আশায় উল্লসিত এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিপর্যয়ে আপনি বিচলিত হয়ে উঠেন? আমি জানি—কোন মানুষ স্বজাতি ও স্বদেশকে ভাল না বেসে পারে না। আপনি যতই নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করুন না কেন, আপনার মনকে তো আর আড়াল করা সম্ভবপর নয়। আপনি জানেন আপনার অনেক করণীয় আছে। আপনি সবকিছু দিয়ে কামনা করেন—জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক। তবুও পিতৃদত্ত প্রাণ ও পিটের চামড়া বাঁচানোর জন্য কতোই না মিথ্যার অভিনয় করে চলেছেন। একবার আত্মজিজ্ঞাসা করুন—সরকার আপনাদেরকে কতটুকু আপন করে নিয়েছে কিংবা কতটুকু আপনি বিশ্বাস স্থাপন করাতে সমর্থ হয়েছেন? সব কথার শেষ কথা হচ্ছে—আপনি একজন জুম্ম। সুতরাং—যদি আপনি জুম্ম জনগণের দুঃখে কাতর হন, মনে ব্যথা পান; বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচার উৎপীড়ন মানবতা পরিপন্থী বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম একটা ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম বলে মনে করেন। শত শত মা বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে চান, শত শত বাপ ভাইয়ের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন রোধ করতে চান, দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের ঐক্য শক্তি কামনা করেন, অনাহারে অর্দ্ধাহারে ক্লিষ্ট জুম্ম জনগণের অভাব মোচন করতে চান, জুম্ম জাতির সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম ও নীতিবোধ রক্ষা করতে চান, জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমি অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টি পেতে চান, জনসংহতি সমিতির আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে পারেন, জনসংহতি সমিতির নেতা ও নেতৃত্বের উপর নির্ভর করতে পারেন, আত্মনির্ভরশীলতা ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রণনীতি বিশ্বাস করে থাকেন, উগ্র ধর্মান্ধ বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদ থেকে মুক্তি পেতে চান—তাহলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে আপনার ভূমিকা কি হতে পারে সে সম্পর্কে আপনাকেই অনতিবিলম্বে বেছে নিতে হবে।

পরিশেষে যারা জনসংহতি সমিতির নেতা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বিজয় সম্পর্কে সন্দিহান অথচ শত্রু বাংলাদেশ সরকারের দমন নীতির প্রতি ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং যারা সরকারের শক্তিকে অত্যাধিক পরিমাণে বড় করে দেখে থাকেন; অথচ জুম্ম জনগণের উপরে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক যে অভাবনীয় ও সীমাহীন অত্যাচার উৎপীড়ন করা হচ্ছে তজ্জন্য খুবই দুঃখ ও ব্যথা বোধ করেন আর বাংলাদেশ সরকারের হীন নীতি ও কৌশলের সাথে একমত হতে পারেন না কিন্তু ভীরুতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতার জন্য এসব অত্যাচার, উৎপীড়ন ও হীন নীতি কৌশলের প্রকাশ্য বিরোধীতাও করতে পারে না; সর্বোপরি সময়ে জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম, নীতি ও কৌশলের সাথে একমত হতে না পারলে কিংবা স্বীয় স্বার্থের কোন হানি ঘটলে তখন ডুইং রুমের রাজনীতিজ্ঞ হয়ে জন সংহতি সমিতির নেতা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে অশালীন ও অশোভনীয় মন্তব্য করে থাকেন। বলাই বাহুল্য নিজেরা ত্যাগী ও সাহসী হয়ে আন্দোলনে যোগও দিতে অপারগ অথচ ঘরে বসেই কতোই না আস্ফালন—সেইসব ভীরুপাল ও স্পষ্টবাদীদের উদ্দেশ্যে আমার গুটি কয়েক কথা হচ্ছে—আজ জুম্ম জনগণ এক অসম শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাই জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের শক্তির তুলনায় বাংলাদেশ সরকার সামরিক শক্তির দিক দিয়ে শতগুণে বলীয়ান—এটা বাস্তব সত্য। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনা সবই শত্রু পক্ষের নিয়ন্ত্রণে। তাই শত্রু পক্ষের অস্ত্র, গোলাবারুদ অর্থ ও সৈন্যশক্তির অভাব নেই পক্ষান্তরে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ সামরিক শক্তিতে দুর্বল, যোগাযোগের আধুনিক উপকরণ নেই, এলাকা ছোট ও জনসংখ্যা অতি নগন্য সর্বোপরি জুম্ম জনগণ অতিশয় গরীব ও পশ্চাৎপদ।

কিন্তু কোনদিন কি একবারও গভীরভাবে তলিয়ে দেখেন নি যে শত্রু বাংলাদেশ সরকার বাহ্যতঃ খুবই শক্তিশালী হলেও মূলতঃ খুবই দুর্বল। কেন না জুম্ম জনগণের সংগ্রাম হচ্ছে একটা ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম পক্ষান্তরে শত্রু বাংলাদেশ সরকার অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত। জুম্ম জনগণের একটা নীতি আদর্শভিত্তিক শক্তিশালী রাজনৈতিক পার্টি জনসংহতি সমিতি আছে; এই রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে রয়েছে নিখাদ দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি সুশৃঙ্খল সশস্ত্র সংগঠন—শান্তি বাহিনী যে বাহিনী ধর্মীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমি অস্তিত্ব সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ও অকুতোভয়; প্রাচুর্য্যে ভরা পার্বত্য চট্টগ্রাম; এদেশের নদী ঝর্ণা বন-উপবন পশুপক্ষী পাহাড়, চড়াই-উৎড়াই, বাঁশ গাছ তথা প্রকৃতির সবকিছু আন্দোলনের অনুকূলে; জন সংহতি সমিতি তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পক্ষে রয়েছে জুম্ম জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা; এদেশের জুম্ম নরনারী ঐক্যবদ্ধ; জুম্ম জনগণ নিপীড়িত শোষিত তাই তারা মুক্তিকামী ও সংগ্রামী, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব আজ স্বদেশে বিদেশে সুপরিচিত ও জুম্ম জনগণের ন্যায় সংগ্রাম আজ বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বের মানবতাবাদী বিবেক আজ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সপক্ষে, তাই সমগ্র বিশ্বে জুম্ম জনগণের পক্ষে রয়েছে অগণিত সহানুভূতিশীল মানুষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। সর্বোপরি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ লড়াই করছে না,—উগ্র ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধেই এই লড়াই চলছে। তাই বাংলাদেশের মানবতাবাদী ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, চাকুরীজীবি ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ তথা কোটি কোটি নরনারীর আন্তরিক শুভেচ্ছা এই ন্যায় সংগ্রামে রয়েছে; পক্ষান্তরে শত্রু বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে একটা সামরিক সরকার—এই সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ জনসমর্থন নেই, ক্ষমতাসীন সরকারের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে শত্রুর উপর রয়েছে আন্তর্জাতিক চাপ, উপরন্তু অত্যাচার উৎপীড়ন করে কোনদিনই এই প্রকারের আন্দোলন দমন করা যায় না; শত্রু অতি দ্রুতগতিতে সামরিকভাবে এই দ্বন্দ্বের অবসান (ধ্বংস) করতে চায়। যা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রণনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ছাড়া ক্ষমতাসীন সরকারের অভ্যন্তরে জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রদানের সমর্থকও রয়েছে। বাংলাদেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন সমূহ এই আন্দোলনের পক্ষে বরাবরই অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে—আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে জয়যুক্ত করতে যে সব বিষয় একান্তই থাকা বাঞ্ছনীয় সে সবই তো জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের এই বাঁচা মরার সংগ্রামে বিরাজমান। পক্ষান্তরে—শুধু সামরিক মদমত্ততা, দুর্নীতি ষড়যন্ত্র, অর্থ ও সীমাহীন নিষ্ঠুরতা অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অপপ্রচার চালিয়ে একটা মুক্তিকামী ঐক্যবদ্ধ জনতাকে যুগে যুগে বিশ্বের কোথাও ধ্বংস করা সম্ভবপর হয়নি। যুগে যুগে শোষক ও উৎপীড়ক শোষিত ও নিপীড়িতদের কাছে বারবার পরাজিত হতে বাধ্য।

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম আকাশ থেকে পড়েনি। যুগ যুগ ধরে শাসন শোষনের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করার মাধ্যমেই এই আন্দোলন গড়ে উঠতে পেরেছে। তাই এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আমার, আপনার তথা সকলের। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার প্রতিটি জুম্ম নরনারীর পরম দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পথে অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি অসব সমস্যা সফলতার সাথে একটির পর আরেকটি সমাধান করে আসছে। মাঝখানে ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে এই আন্দোলনের অনেক অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে সত্যি তবুও বর্তমান নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন আগের মতই এমন কি—কোন কোন ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশী উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের ধারক বাহক চার-কুচক্রী উৎখাত হয়েছে। শান্তি বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ বেড়ে গেছে। সমগ্র কর্মী বাহিনী আগের চেয়ে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে এবং পোড় খেয়ে অনেক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। বর্তমান নেতা গৃহযুদ্ধের মতো এক অতি জটিল সমস্যা সমাধান করে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। সর্বোপরি পার্টি নেতৃত্বের সুযোগ্য পরিচালনায় ও দুরদর্শিতায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বিশ্বের দরবারে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম হিসেবে আরো পরিচিতি লাভ করেছে অথচ জুম্ম জাতির কর্ণধার এম, এন, লারমা নিহত হওয়ার পর—পার্টি টিকে থাকবে কি থাকবেনা এই নিয়ে আপনাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনার শেষ ছিল না। আপনাদের অনেকে মন্তব্যের মধ্যে জনৈক চাকমা বুদ্ধিজীবির হতাশাব্যঞ্জক ও প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্য—"পুয়াবুঅ বাজি নেই আর ইজে সংকার গর গৈ" (অর্থাৎ পার্টি ধ্বংস হয়েছে, পার্টির আশা ছেড়ে দাও) বুদ্ধিজীবিদের ভীরুতা ও হীনমন্যতার পরিচয়ই বহন করে— তা নয় কি? কিন্তু আজ আপনারা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন যে, পার্টি আজ আগের চেয়ে অনেক গুণে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আগের মতো আর পার্টির সদস্যগণ বৈরীতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সুতরাং জনসংহতি সমিতিও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জুম্ম জনগণের হাজারো জিজ্ঞাসা রয়েছে সে সব জিজ্ঞাসার উত্তর (সমাধান) আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহই সাক্ষ্য বহন করে যাবে। হাজারো জিজ্ঞাসার একমাত্র সমাধান হচ্ছে "আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়"। সুতরাং এই সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন—দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের সচেতন সম্মিলিত শক্তি। পাশাপাশি জন সংহতি সমিতির সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধি করে এদেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, চাকুরী জীবি, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাষী, যুবক, যুবতী, নারী পুরুষ তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষেরা সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে—জনগণের সম্মিলিত শক্তিই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের মূল চাবি কাঠি। সুতরাং একদিকে উগ্র ধর্মান্ধ বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদের ধারক বাহক বাংলাদেশ সরকারের—যে আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করণ, জুম্ম জাতিগুলোর মধ্যে

ভেদাভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করণ; সীমাহীন অত্যাচার-উৎপীড়ন, জেল জুলুম, হত্যা জ্বালাও পোড়াওর মত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও কৌশলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং অপর দিকে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সমূহ আরো ঐক্যবদ্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধি করার মধ্যেই আপনার, আমার তথা সকলের ভূমিকা নিহিত রয়েছে।

দিবা স্বপ্ন

—শ্রী প্রজিৎ

একদা চুপিসারে কহিল ফকির প্রকাশ
সুজিব কি সুরতন প্রাণাধিক পলাশ?
মৃদু হেসে কহে পলাশ, পারি গো পারি
গিরি সাগর বিদ্যুৎ সাথে থাকে যদি।
ঈষৎ হেসে প্রকাশ পেল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস
গোপাল্যা সহ স্বর্গারোহন হবে করগো বিশ্বাস।
দম্ভভরে ডাক দিল কোথা হে শরজিৎ?
যাও এবে বুঝাইতে মানুষ তাতে তুমি মহাপণ্ডিত।
দেবেন মশাই ষড়যন্ত্র আর ভণ্ডামীতে বড় পাকা
সন্তাসনে বসে তুমি ঘুরাবে বিপরীত চাকা।
রোমেল, এলিন, এ্যাম্ং, দীপায়ন পেল নবজন্ম?
মদমত্ত প্রকাশ ভাবে পুরণ হবে মোর স্বপ্ন।
ধূর্ত সুমন; শিয়াল পণ্ডিত বিলাস থাকে মাঝামাঝি
সুরতনের স্বপ্নে আর গুপ্ত প্রণয়ে মাতাল ওদিকে গিরি।
মানবতার বিরুদ্ধে চার কুচক্রী হইল আগুয়ান!
অবশেষে বীরবিক্রমে পালাল লইয়া পিতৃদত্ত প্রাণ।
মরণের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকায় এদিক ওদিক প্রকাশ—
চতুর্দ্দিকে হতাশা, ব্যর্থতা—আর নয়রে পলাশ।
ক্ষমতার লোভে, প্রেয়সীর সাধ ভেকেছ মৃত্যুর লগ্ন।
বালিতে যে বাঁধ, স্বজাতির সর্বনাশ, সুরতনের দিবাস্বপ্ন।

সাধের স্বপ্ন রাজ্য

—শ্রীসুন্দর

হায়রে ——————
আমার সাধের স্বরতন রাজ্য
কেন তুমি ব্যর্থতার চোরাবালিতে
আমার চোখের সামনে তলিয়ে গেলে ?
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ,
হেমন্ত, বসন্ত—এমনি করে
বছরের পর বছর, আমি সবার অলক্ষ্যে
চেয়েছি স্বপ্নরাজ্যের ষোড়শী—চপল নিতম্বের আমন্ত্রণ।
তাই—
অনাদি সুখের সুপ্ত নেশায়
ষড়যন্ত্রের জাল বুনে,
ক্রমশ হলাম উদ্‌ভ্রান্ত—
পেতে হবে, ধরতে হবে, আমার জেদ চাপল মাথায়।
বিগত বারোটা বছরের স্রোত প্রবাহে
আমার উদ্‌ভ্রান্ত চেতনায় কলঙ্কিত নিঃশ্বাস রয়েছে।
প্রতিটি পদক্ষেপে এঁকেছি ষড়যন্ত্রের ছক,
রাত্রিরাতে রুদ্ধ কক্ষে খুঁজেছি হত্যার নীল নকশা ;
হঠাৎ পেয়েছি সমাধান—
উনিশ-শ-তিরাশির দশই নভেম্বর !
কিন্তু সত্যিই কি পেয়েছি সমাধান ?
অথচ সেদিন—
ইউরেকা, ইউরেকা বলে করেছি
জুম্ম জাতির সর্বনাশ সাধন।
আজ আমি রণক্লান্ত !
ব্যর্থতার গ্লানি বুকে নিয়ে, হারানো স্বপ্নকে
খুঁজি রাজধানীর পিচঢালা পথে অথবা
প্রিয়তমার কক্ষপুটে, ফেলি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস।
শান্ত্বনা খুঁজি রূপালী পর্দায়—পথে প্রান্তরে ;
কিন্তু হায় ! কোথায় আমার সেই সাধের স্বপ্নরাজ্য স্বরতন ?

A genesis of the movement for self determinatin of the Jumma people of Chittagong Hill Tracts and its future.

—Sree Uttaran

Chittagong Hill Tracts (CHT), predominantly a land of ten ethnic national minorities of Chakma, Marmá, Tripura. Chak, Murung, Khumi, Lushai, Bowm and pankho and formerly a part of East Pakistan (during the era of Pakistan) has become a part of Bangladesh after its emergence as an independent state in 1971. CHT is located between 21°—10′ and 23°—47′ north latitude and between 91°—40′ and 92°—42′ East longitude. It roughly covers an area of 5,138 sq. miles and is bounded on the north by Tripura State of India ; on the South by Arakan Hills of Burma ; on the East by Lushai Hills of Mizoram and Arakan Hills of Burma and on the West by Chittagong District. In 1947, during the birth of Pakistan the ethnic population of CHT Comprised of 97·5 ·/. of the total population and the Muslim population constituted 1·5 ·/. only Of the ten national minorities the Chakmas, the marmas, the Murungs, the Khumis, the chaks profess Buddhism ; the Tripuras believe in Hinduism ; the Lushai, the Bowms, the pankoos and the Khyangs practice Christianity. Though these people possess diverse national identity, they have cultural, religions and ethnic affinity among themselves quite different from the Bengali Muslims, the ruling and dominant class in Bangladesh. The indigenous people of CHT have been living side by side for centuries together without any racial conflict. CHT is, basically, the land of ten national minorities. They want to maintain their district national, cultural and ethnic identity and manifest in their own way.

It is irony of fate that the people of CHT subjected to centuriés political, economic ane cultural persecution during the British rule, the Pakistan rule and now in the cruel hands of the extreme Bengali Muslim nationalistic and Islamic fanatic, Government of Bangladesh, they face total national extermination. They have become a prey to racial discrimination in the hands of Bangladesh Government. So, for guaranteeing the safeguards for national existance the people of CHT have started movement for self dêtermination in the seventies after the birth of Bangladesh. There has been continuing a struggle for national existance and self determination by the people of CHT in one hand and a war of total national extinction of the people of CHT by the Government of Bangladesh on the other. To develop a profile of the causes of movement and struggle against the Government of Bangladesh by the people of CHT one should study the genesis of the movement and traverse into deeper historic past of CHT. The people of CHT had been

under the British rule, the Pakistan rule and at present the rule of Bangladesh Government. A comparative study of these three rules will reveal how the people of CHT had been subjected to foreign domination and their conditions deteriorated miserably with the pace of time. One will find that the struggle of the people of CHT against the Government of Bangladesh is not a misnomer of historical event but a natural corollary and outburst of centuries suppressed sorrows of thousand of people

The people of CHT had a life unfattered by foreign domination before the advent of the British East India company. The East India company had to engage into several blood fued battles before subjugating CHT. The first battle of the people of CHT with East India company ensued in 1772 and subsequent battles in 1777, 1778, 1780 and 1782. In 1787 after about one and half decade of fighting the Chakma Raja, Jan Bux Khan signed a peace treaty in fort William, Calcutta. Under this agreement the quasi-independent status of CHT was recognised. CHT reduced into a tributory state of British India in 1787. From 1787 to till 1860 the British Government did not intervene in the internal administration of CHT. After 1860 and until 1900 the British Government administered CHT through a set of rules promulgated from time to time. For the maintenance of discipline among the police personnels CHT. Frontier police Regulation III of 1881 was promulgated on the 7th December, 1881. For the good Government of CHT, the CHT Regulation was promulgated in 1900. In the 1900 CHT Regulation it was clearly stated that :—

"No person other than a Chakma, Mogh or a member of any tribe indigenous to CHT, the Lushai Hills, the Arakan Hill Tracts or the State of Tripura shall enter or reside within CHT unless he is in possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion" Thus, the 1900 CHT Regulation provided for limited Self Government by the people of CHT and this was strictly followed by the administration. The British Government divided CHT into three revenue circles namely, the Chakma circle, the Bohmong circle and the Mong circle each headed by a Raja or chief in 1881. There were 33 blocks formed in 1880 for the census of 1891 and, had been constituted permaneat divisions and were calle d 'TALUK' in CHT. Subsequently, these Taluks were sub divided into Mouzas or taxation areas, Administrative changer were made in CHT under British rule :

(1) On 1921, the 1900 CHT Regulation was amended to declare CHT a 'BACKWARD TRACT' and gave the Governor in council sole authority in the area.

(2) The 1935 Government of India Act created CHT a totally 'EXCLUDED AREA' and so granted further recognition to the special status of CHT.

The CHT Regulation could not meet up the aspiration of the people of CHT. It made the Deputy Commissioner so powerful that he could do or undo everything. There was no provision for popular representation in the affairs of CHT by the Regulation. The chiefs of the three circles, the Headman in the Mouza and Karbari (Head of the villagers) were key links with the Deputy Commissioner and to the people. The chief and the Mouza headman were the heredifary representatives of the people nominated by the Deputy Commissioner at his discreation. The chief, the head man and the Karbari were all self centered and guided by self interests. Thus, in the name of maintenance of peace and trampling down the political consciousness of the people of CHT the British Goverment made a typical hereditary aristocracy or priviledged class in the society. These typical aristocrats never paid attention to the general well being of the people and were puppets to the Deputy Commisioner, There was ban on politics in CHT. By the 1900 Regulation of CHT the Deputy Commissioner had the capacity and power

to arrest a person even carrying a 'DAO' or country made iron instrument used for household work, no person was allowod to carry even a 'DAO' or a spear by the 1900 Regulation of CHT, yet amidst of strict political stringency and bareness there was formed a political organisation in the name of 'CHAKMA JUBAK SANGHA' in 1928 under the leadership of Ghanashyam Dewan. It was a mile stone in arousing political sentiment in CHT in later stages.

The British rule was over. The Indo-Pak sub continent was divided into two dominions—India and pakistan on 14th August, 1947 under the 1947 Act of British Parliament, Pakistan dominion was to form on the basis of Muslim majority areas or provinces, while the Indian dominion with the non Muslim majority areas on provinces of the then India. Pakistan was created as 'Home land' for the muslims. CHT being a non-muslim majority area, its people thought that CHT would be a part of India, a more democratic and secular state in relation to the undemocratic and Islamic fanatic state of Pakistan. But the result was quite opposite, Sir Cyrill Radcliffe, Chairman of the Bengal Boundary Commission with a stroke of pen trampled down the aspiration of the people of CHT. The Bengal Boundary Commission declared CHT as part of Pakistan on 17th August, 1947 two days after the declaration of Pakistan independence. As a matter of fact, according to the primary Survey reports of the 'Boundary Commission' CHT was to form a part of India. The mystery lies in the fact that the district of Zira and Ferozpur sub—division of Punjab, predominantly a sikh populated area fell in to the Pakistan as envisaged in the early reports of Punjab Boundary Commission. As the sikhs are a brave and warrior nation they might not abide by the decision of the Punjab Boundary Commission if a part of sikh dominated area would fall in to Pakistan. Lord Mouat Batten Governor general of the then India feared that the plan for Indian division might go futile; so he took it with serious concern. There fore, lord MountBetten cancelled his primary plan and awarded CHT to Pakistan two days later after the declaration of Pakistan indpendence in exchange of Zira district and Ferozpur Sub-division with India. It was incompitable with the India independence Act of 1947 by the British government. The people of CHT could not abide by the decision of the Bengal Boundary Commission. 'THE PEOPLES ASSOCIATION', a socio political organisation of CHT under the leadership of Sneha Kumar Chakma unfurled the Indian national flag on 15th August, 1947. The leadears of the peoples association formed resistance squads to defy the decision of the Bengal Boundary Commission. But all their efforts were thwarted when the Baluch Regiment of Pakistan Army entered into CHT and proclaimed control over the area. They lowered the Indian flag and raised the flag of Pakistan on the 21st August, 1947. The cry of the people of CHT could not raach the deaf ear of the Indian national leaders. Thus, the division of the sub—continent into India and Pakistan turned into a curse instead of blessings to the people of CHT. It was better to remain under the British rule for them. The division of the sub—continent had opened the darkest and most tragedious chapter in the history of the people of CHT.

The Pakistan government could never see the people of CHT in good eyes. Soon after the independence it repealed the CHT Frontier Police Regulation III of 1881 and replaced it by the East Pakistan Police Act. Pakistan government though did not dare to cease the 1900 Regulation of CHT it had maintained grim view on the people of CHT, It considered the indigenous people and especially, the Chakma people as hostile elements and pro-Indian. Therefore, the Pakistan Governments' ultimate aim was to exterminate

the people of CHT through its SOCIO—POLITICAL ECONOMIC POLICY. In implementing her brazen designs, Pakistan Goverment brought some thousands of Muslims from other districts of East Pakistan into CHT as settlers in the early fifties in clear violation of the principles and spirit of CHT Regulation of 1900. The people of CHT lodged protest with the governments of Pakistan against her Conspiratory policy. Pakistan Government maintained deaf ear althongh, it suspended its Muslim settlement programme for the time being. Barring this, in order to materialise its evil design and breaking down the economic backbone of the people of CHT. Pakistan Government in the name of industrialisation, built a multipurpose Hydro-Electric Project at Kaptai on the river Karnafuli in 1960. The reservoir created by the Hydro electric project submerged 253 sq miles-top class agricultural land that constitutes 40·/. of total cultivable land in CHT. The area affected by the Karnafuli Project is the nucleus of CHT. By it, one hundred thousand people were up-rooted from their ancestral lands and were neither properly compensated or rehabilitated. In a publication of the Far Eastern Economic Review in 1980, it was amply stated that $ 31 millions was set aside by the Government for rehabilitation. Only $ 2.6 milions had actually been spent. By Karnafuli project people became panicky and because of insecurity, finding no alternative more than 40,000 people migrated to India in 1964 more than 20,000 people migrated to Burma in the same year. Not satisfied with this, Pakistan Government after an amendment of the constitution in 1963 ceased the 'EXCLUDED AREA STATUS OF CHT' as granted under the Regulation of 1900. What is more naked is that Pakistan Government hit upon a surreptitious policy of depopulating the indigenous population of CHT by encouraging the settlement of Bengali Muslims in CHT from other districts of East Pakistan. Consequently, Bengali Muslim settlers in thousands streamed in to CHT and begun to grab the lands of the indigenous people in the midle and the last of sixties. In this way, Pakistan Government had successfully materialised its vilest SOCIO—POLITICAL—ECONOMIC POLICY in exterminating the indigenous people of CHT.

The reaction of the people of CHT against the nefarious policy of Pakistan was alarming. As a result of repressive measures followed by Pakistan Government, discontent and resentment was simmering through out CHT. Educated people, in particular, the students who had been imbibed with modern political cansciousness and thinking had thought of ways of withstanding the repressive policy of Pakistan Government. Manabendra Narayan Larma, President and founder of the Jana Samhati Samiti (The United Peoples Party) and Champion of national awakening in CHT was a student leader in the early sixties. He had to undergo detention for a protest against the unjustified and improper Compensation and rehabilitation to the affected people of Karnafuli dam by Pakistan Government in February 10, 1963. He was released from detention on March, 8, 1965. After his release from detention, he contemplated in the unification and organisation of hither to scattered student Community of CHT. By his dynamic leadership students and educated people became more and more unified and Conscious of their centuries repressions in all spheres. 'The Chittagong Hill Tracts Tribal Students' Association' which was reconstituted in 1956 under the leadership of the then student leader Ananta Bihari Khisa and Sudhakar Khisa became more unifeid and organised in early sixties under the leadership of M. N. Larma with a definite political aim an objectd. 'The Chittagong Hill Tracts

Tribal welfare Association was formed in 1966 under leadership of Jyotirindra Bodhipriya Larma (Santu Larma), younger brother of M. N. Larma, the present leader of the Jana Samhati Samiti and Ananta Bihari Khisa which served as a turning point in the emergence of National sentiments of the people of CHT in the later years. 'The Chittagong Hill Tracts Teachers' Association' was also formed during this time under the leadership of J. B Larma with definite political aim and object. 'Tribal Welfar Assoiation' Contested in the East Pakistan Provincial Assembly election held in 1970 in the name of 'Parbattya Chattagram Nirbachan Parichalana Committee' (Chittagong Hill Tracts election organising Committee) through which M. N. Larma contested from the Northern constituency and was elected with majority votes as member of East Pakistan Provincial Assembly (M. P. A.). The election organising committee of CHT had 16 points demand in its election manifesto. 'Autonomy with own legislature for CHT was the main point'. This received wide support from the people of CHT during the election. M. N. Larma unequivocally raised the demand for autonomy for CHT. Soon, the Bangladesh liberation movement took a serious turn reaching its climax dramatically. After March 26, 1971 the law and order situation in East Pakistan entirely collapsed and the provincial Assembly virtually ceased to function. Then M. N. Larma organised the students and youths of CHT to join Bangladesh liberation movement. But the Awami League leadership with its ill motive pushed out the people of CHT from joining the liberation movement. Even Shree K. K. Roy (uncle of Raja Tridiv Roy, Chakma Chief) an Awami League candidate for 1970 East Pakistan Provincial Assembly election, when crossed into India to join election movement was arrested and insulted at Agartala in a Conspiracy by H. T. Imam, the Deputy Commissioner of CHT and a district Awami League leader md, Syedur Rehman. Therefore, the future of CHT had to ponder over the future of CHT again.

The liberation movement of Bangladesh in 1971, which ultimately resulted with the victory on 16th December, 1971 and an independent Bangladesh came into being. The victorious 'Mukti Fauj' (Freedom Fighters) entered in to CHT with Vengeance and Communal hatred, creating a reign of terror situation through out CHT. The Mukti Fauj fellupon the innocent tribal people, killing, looting, arsoning and raping women, burning houses and villages, victimising and terrorising the inhabitants who were forced to take refuge in the jungles. Wide range discontent and unrest that resulted from terror through out CHT let loose by the Mukti Fauj, forced the people to assemble into a Common political platform with the formation of 'JANA SAMHATI SAMITI' (The united Peoples Party) on February 15, 1972 under the leader ship of M. N. Larma.

Raja Maung Prue Sein Chowdhury, Mong Chief, the then Adviser to Bangladesh Government on tribal affairs and M. N. Larma, President and leader of Jana Samhati Samiti led a delegation to Sheikh Mujibur Rehman, Prime Ministar of Bangladesh on February 15, 1972 in protest against Mass killings and atrocities Committed by the Mukti Fauj in CHT and placed before him a four point Memorandum demanding autonomy for the people of CHT. The four points were :

1) CHT will be an autonomous Region with its own legislature ;
2) For the safeguard of the rights of the Jumma people a Statutory Provision must be guaranteed in the Constitution similar to the CHT Regulation of 1900 ;
3) Administrative set up of the tribal Chiefs be retained ;
4) There must be a Constitutional provision with a guarantee that no constitutional amendment on matters relating to CHT will be made without the priorr consent of the people of CHT.

M.N Larma led another delegation to the Bangladesh Draft Constitution Framing Committee on April 24, 1972 with a view to placing before it a memorandum containing five point demand which includes a demand for Regional autonomy with its own legislatrue for the people of CHT and to see there points are enshrined in the constitution. The impact was that Sheikh Mujib refused to accept M. N. Larma's demands. Instead, he forbade M. N. Larma not to meddle with affairs of CHT. He threatened him with dire consequences and told him that one million Bengali Muslims would be sent to CHT. But M. N. larma was not a man to be scared. In 1972 Bangladesh constitution was framed. The Awami League government ceased the existance of separate status of CHT in its constitution. Under the guise of democracy, Nationalism, secularism and socialism the nationality for the people of Bangladesh was made to be as Bengali though there are various national minorities who are not Bengalis and have a distinct culture and language of their own. M. N. Larma was elected as member of the Bangladesh Parliament in its first election held in March 7, 1973 The Jana Samhati Samiti in its election manifesto declared fifteen point demand including Regional autonomy with separate legislatura for CHT and on the basis of these points M. N. Larma won a landslide victory in the election. M. N. Larma opposed in the parliament, for national Minorities being called as Bengalis. He claimed : "A Bengali can never be a Chakma and vice—versa" He strongly reiterated the demand for autonomy for the people of CHT, analysing their separate history, distinct culture, ethnic identity and centuries old political, cultural and economic problem of CHT. But all his efforts ended in failure and he was termed as separatist and hostile to government of Bangladesh.

When the constitutional movement ended in failure, the only means to safe guard the national existance of the people of CHT was through armed struggle. M. N. Larma, J. B. Larma, and other top members of the Jana Samhati Samiti and the Hill Students Association were all dismayed and gave up hope for guaranteeing national existance through constitutional process. They all agreed to take up armed struggle in order to achieve its right from Bangladesh Government. An armed wing of Jana Samhati Samiti was created under the name of Shanti Bahini (PEACE FORCE). It was due to M. N. Larma's strong leadership and organising capacity that the people of CHT were unified within a short period. He had to manoeuvre both constitutional and unconstitutional movement during the first phase of it. He was able to draw the attention and support from the people for armed struggle for the right of self—determination for the people of CHT. A parallal administration was set up in CHT. The movement took a new shape.

In the meantime, Sheikh Mujib,s government in a bid to forestall the arrest of the movement of the people of CHT has started increasing the number of its police posts and deployed the army, BDR, BRP and other para military forces in the CHT

Thousands of innocent people and many party workers were victimised due to brutal suppression forces. By this time, the Sheikh Mujib Government started bringing thousands of Bengali Muslim families in to CHT from other districts of Bangladesh with a sinister motive to outnumber the indigenous population of CHT. Regime of Sheikh Mujib did not last long. He wes toppled and killed in a bloody Coup in August 15, 1975 by the Army. Martial law was proclaimed throughout the country. After wards, a delegation consisting of 67 representatives from CHT on November 19, 1975 called on President Justice A. S Sayem and submitted a memorandum to him reiterating the demand for regional autonomy. But the attempt was a fisco.

After As. Sayem Maj, gen. Ziaur Rehman became the President of Bangladesh. He kept the flow of infiltrating Bengali Muslims in to CHT till he was killed in an abortive Coup in 1981. Then Came Abdus Sattar as President of Bangladesh. During his Tenure infiltration of Bengali Muslims was carried out more nakedly. Abdus Sattar was toppled by Lt. Gen. H. M. Ershad in a bloodless coup in March 24, 1982 and Martial law was declared throughout the country. Thus it is evident that from Ziaur Rehman to H. M. Ershad— Bangladesh has been ruled by successive military juntas and some times with a titular President as Head of the State but themselves remaining as Chief Martial law Administrator of the Country Both the generals and their Governments persued the repressive policy in CHT like the Awami League Government in the past and even surpass the Awami Leagne regime in its brutality and barbarity. In suppressing the movement in CHT both Ziaur Rehman and H. M. Ershad instituted their most destructive and heinoos SOCIO—ECONOMIC—POLITICAL—MILITARY policy in CHT. The characteristics of this policy may be summed up :—

1) The Bangladesh Military junta wants to solve the political problem of CHT. militarily by imposing its military & para-military forces. It has set up as many as 3 (three) full fledged cantonment, one Naval Base at Dhalyachari, (Kaptai), one School of Jungle warfare at Mahalchari, 43 Army Camps. 30 BDR Camps, 33 APB Camps, 49 BRP and Ansar Camps, in addition to 28 police stations. It is estimated that, near about 60,000 Army BDR, APB, BRP, Police, Ansars and Village Defence forces have been deployed in different strategic places of CHT.

2) The Bangladesh Government in order to exterminate the people of CHT has been pursuing scharched Earth policy through out CHT. Two high ranking army officers in May 25, 1979 in a public gathering at Panchari attended by Abdul Awwal, then Commissioner of Chittagong Division, Ali Haider Khan, then Deputy Commissioner of CHT and other dignitories of CHT, declared— "We want only the land and not the people of CHT." In consonance with the remark made by the two army officers, the very policy of the military junta Came in to effect by unleashing its army, BDR, BRP and other para-military forces on the innocent people of CHT bringing untold miseries due to atrocities and tortures, indiscriminate mass Killing. raping of woman & cutting of their breasts, Cordoning, arrests & interrogation, abduction, pillage, arson, ransacking of religions temples, encagement of Villagers in Concentration Camps in the name of ideal villages, Joutha Khamars (Joint Farming) better known as strategic village nearly the Camps where the security forces rape the tribal women, flogging, electric shocks, hanging upside down, pouring water through the nose and mouth till suffocation, throwing into muddy pits, pinching needles in to fingers, putting grinded pepper water in the eyes, setting lighted match sticks in the body and with holding food and water while in their custody. All these are but beggar descriptions.

3) The military junta is determined to carry out genocide in CHT in collaboration with Bengali Muslims settlers and to settle more of Bengaii Muslim population in the tribal lands. The massacres by the Bangladesh Army and para-military forces are as follows—the Kalampati Massacre under Rangati P. S. in March 25, 1980; the Feni valley Massacre in November, 1981 under Ramgarh Sub division and the Bhusan chara, Tarengya ghat, gorosthan, Choto-Harina, Bhusan Bag, Head Bhoria Massacres in May 31, 1984 undar P.S Barkal, cost more than two thou-

sand lius. Thousands of people were burnt to ashes with all their belongings. Their farm lands were occupied by Bengali Muslims. The Kalampati massacre was immediately visited by an enquiry team of parliamentarians

Bhusan chara genocide

Consisting of Shahjehan Siraj M P, Rashed Khan Menon, M P, and Upendra Lal Chakma, M P, from CHT northern Constituency who commented after their visit that the massacre was a brutal one and Bangladesh Government had conspired it and responsible for it. As a result of Co-ordinated attacks by the Army and Bengali Muslim settlers during the Feni Valley operation in 1981 nearly twenty thousand people were forced to take refuge in India for life security. After a bilateral talk between India and Bangladesh, these Chakma, Marma & Tripura refugees were to be repatriated on a guarantee of life security, due Compensation, return of their farmlands forcibly occupied by Bengali Muslims. But on their repatriation back to their home the found that Bangladesh Government did not honour the terms of the agreement. As a result of Bhusan Chara and Head Bhoria massacres the Chakma refugees in Mizoram of India are still passing their lives in miserable conditions under malnutrition and with uncertainty in refugee Camps.

4) The Military junta has been pursuing a policy of religious and social persecution in CHT systematically, law enforcing forces ransacked and desecrated scores of Buddhist temples— plundered the property of the temples, images & statues of lord Buddha were kicked broken, Buddhist monks were tortured and forced to perform 'Namaj' (Muslim Prayer) in the name of Allah and threatened them for propagating Buddhism and pressurise them to accept Islam. The people of CHT are not allowed to perform social rituals. There are restrictions in the remote areas for performance of social rituals. Even for cremation Ceremony permission is required from law enforcing authorities. Large gathering is strictly prohibited, Anyone performing such social rites without their knowledge, the law enforcing forces open fire on the gathering. There has been many incidents— One such incident occured where a daughter of a Primary School teacher named Binakar Chakma of Panchari, was killed when the security forces opened fire at such gathering indiscriminately in 1984.

5) Bangladesh Government has made a secret plan to preach Islam and with this in view, it has built Islamic Preaching Centre (IPC) and Islamic culture

centre (ICC) at Rangamati with the money received from Saudi Arabia and other Islamic Countries of the world. The Islamic Preaching Centre in CHT which is entrusted with the responsibility of Islamising the indigenous people of CHT, in the name of welfare and helping the people Compels and forces them to attend the Islamic Congregations, distribute food and clothes, furnish Clubs with books on Islamic cultures etc, As a sign of religious intolerance towards other religions shows on Islam with vulgarity towards other religions, are shown on videos and loud speakers are used in giving their Islamic sermons against other religions in the villages violating the human rights of the indigenous people. Hundreds of Mosques have been built pompously in CHT. Millions of Takas are being spent for the propagation of Islam in CHT. Many people are lured with financial help if they embrace Islam. They are also forcibly converting them to Islam. The military junta has in a secret briefing given a green signal to army Officers and soldiers and the Bengali Muslim settlers to marry the young girls of the indigenous people of CHT either through enticement or by abduction and introduced inter-marriage between the Bengali Muslim settlers and the indigenous people of CHT after conversion to Islam. This would ultimately destroy the ethnic entity of the indigenous people of CHT. It is notewoarthy that a fanatic and Communal minded Bangladesh Army officer at Dighinala Cantonment in 1973 named Lt. Kabir lined up the teachers and boys and girls students of Dighinala High School and said, "There will be born Bengali Muslim child in the womb of every tribal women of CHT." Consequently, hundreds of tribal girls and women were abducted, raped and kidnapped by security forces and Bengali Muslim infiltrators.

6) Economic blokade is another form of oppression. To create artificial food crisis, the law enforcing authorities put embargo on the movement of food grains and other items of daily use in CHT. Check posts in strategic places away from Rangamati have been set up to stop the movement of essential goods. People are not allowed to purchase life saving drugs and other medicines. Many people died for want of medicine. People are required to carry cards to buy any item that exceeds more than one kilogram in quantity and obtain permission from the law enforcing authorities. The commodities—Rice, edible oil, salt etc. are always in scarcity due to Government's policy.

7) In the name of development of communications in CHT Bangladesh has built road network in strategic places for the quick deployment and movement of its Army and deeper penetration in to remote areas with the help of Asian Development Bank. The monetary aid or loan that comes from different Countries and agencies most of which is spent on military purpose in CHT. It has nothing to do with the development of CHT and its people. The money is spent for the settlement of Bengali Muslim infiltrators in CHT.

8) Foreign journalists, tourists and even Bangladesh journalists are prohibited to visit the CHT There is strict censorship with regard to CHT, as repression and oppression being perpetrated on the people of CHT by Bangladesh Government and also in fear of the truth about self-determinations for the people of CHT might be published in the news items.

9) Bangladesh military junta implemented its 'DEPOPULATING AND LAND GRABBING POLICY' against strong opposition by the people of CHT and undermining international opinions and of world conscience more nakedly. THE ANTI-SLAV-

ERY SOCIETY ON INDIGENOUS PEOPLE AND DEVELOPMENT SERIES 1984 under caption "THE CHITTAGONG HILL TRACTS MILITARISATION OPPRESSION AND THE HILL TRIBES" unearthed the fact that President Ziaur Rehman presided at a secret meeting in 1979 during which it was decided to settle 30,000 Bengali Muslim families during the following year in CHT. Accordiug to US AID (United States Agency for International Development) in July 1980, the Bangladesh Government decided to settle 100,000 Bengali Muslims in the first phase of this scheme.

It came into light that Bangladesh Government in its council committee secret meeting on 3-10-1982 at 11·00 hours at the secretariat of the .Chief martial law Adminirstator. Dhaka, under the Chairmanship of President H. M, Ershad under took the following agendum—

ALLOCATION OF AN ADDITIONAL FUND OF TK. 5 CRORES FOR SETTLEMENT OF 20,200 MORE LANDLESS FAMILIES FROM THE NEXT DRY SEASON.

THE PROPOSAL IS APPROVED. THE MINISTRY OF FINANCE AND PLANNINO WILL PROVIDE THE REQUIRED ADDITIONAL FUND IN THE CURRENT YEAR'S BUDGET.

The ministry of Home Affairs and the ministry of Finance anq Planning in their action taken in the implementation of the programme states ;

SETTLEMENT OF LANDLESS FAMILIES IN CHT AND BANDARBAN WAS STARTED IN THE YEAR 1979 WITH THE MAIN OBJECT OF INCREASING THE NUMBER OF BENGALI SETTLERS IN THESE TWO DISTRICTS. THE SECOND PHASE PROGRAMME WAS STARTED IN JUNE 1981 WITH A TARGET OF SETTLING 40,000 FAMILIES (APPROX¦ 200,000 persons).

PHASE WISE POSITION AT A GLANCE AT COLUMN—5

	(4)	(5)	(6)	(7)
... ...	Phase	No. of families settled	No. of families deserted	No. of. families Present
... ...	Ist phase	28,515	2,953	25.562
... .	2nd phasel	16 709	4, 769	11, 940
... ...	Extended 2ndphase	7,584	34	7,550
		52,808	7,756	45,052

In July, 1982 a third phase of Bengali settlement was decided in the council Committee secret meeting at CMLA'S Seeretariat, Dhaka under which a further of 250,000 Bengalis were to be transferred in CHT.

In a secret meeting of the council Committee held on 27-9-1983 at 10·00 hours at the CMLA'S Secretariat, Dhaka, under the chairmanship of President H. M. Ershad the following agendum was undertaken.

SETTLMENT PROGRAMNE FOR NON-TRIBALS FOR 1983—84.

THE SETTLEMENT PROGRAMME OF 1983—84 FOR 15,000 FAMILIES WAS APPROVED. DETAILED PROPOSALS WITH REQUIREMENT OF FUNDS AND FOOD GRAINS IN THIS REGARD WILL BE SUBMITTED BY COMMSSIONER, CHITTAGONG DIVISION. THROUGH THE G, O, C, 24TH INFANTRY DIVISION.

Bangladesh Government's policy of Bengali Muslim Settlement programme in CHT Continues in the current year 1985. It is calculated that Bangladesh Government brought about half milion Muslims from other parts of Bangladesh after its independence into CHT. This number of Bengali Muslims does not include those who have already infiltrated during Pakistan period. For the security

of these illegal Bengali Muslim settlers. Bangladesh Government has set up Army, BDR, APB, BRP, and Ancar Camps. Bangladesh Government has formed the Village Defence "Party" by training up the Muslim settlers with weapon handling and armed them in order to liquidate the indigenous people of CHT. As a testimony to this, Bangladesh Government in its council Committee secret meeting held on 3-10-19-82 at 1100 hours at the CMLA'S Secretariat, Dhaka, under the chairmanship of President H. M. Ershad to issue '303 Rifles to the trained V D P personnels instead of shot guns,

Being armed and backed by armed forces and the para-military, the Bengali Muslims settler have started evicting the indigenous people from their ancesrai home land. More than 60./· of the standing arable lands owned by the indigenous people of CHT have been grabbed by the Bengali Muslim settlers with Government backing. When the poor and helpless people of CHT approach the law enforcing authorities for justice they are driven out mercilessly with beatings, harrassments and filthy abuses. There have been quite a number of communal riots created by the Bengali Muslim settlers at the instigation of the Bangladesh administration. Thousands of indigenous people have been uprooted due to communal riots by Muslim settlers and have become landless and living in the jungles for lack of security and living a sub-human life. Every year so many people are dying of starvation in these remote areas to wich the Bangladesh Government remain a silent spectator without any sympathy or humanity for these suffering people whose lands have been forcibly occupied by the Bengali Muslim settlers.

II) Bangladesh Government's policy is to bring a total collapse of the economic foundation of the indigenous people by implementing afforestation programme by the forest Department. The Jhumias (Shifting cultivators) who survive only through slash and burn system of cultivation as there is scarcity of plain land for cultivation, have been deprived because of planting seedlings in 1000 sq miles areas during a period of twenty years. In additions to this, Bangladesh Government in 1913 with assistance from Asian Development Bank has under taken a plan for afforestation of about 18,000 arces of land slopes with estimated expenditure of $ 4·33 milion. The area covers western side of the river Chengi from Mohal chari to Panchai. Ultimately, the people made land less and finding no other source for Cultivation, would be turned in to Coolies (Labourers) in these Government made gardens and forests.

Thus, Bangladesh Government through its Socio-Economic —political and military policy in CHT has marginalised the people of CHT politically, socially, economically and above all ethnically. There is racial discrimination in CHT by Bangladesh administration and it has declared an ethnocidal war on thh indigenous people of CHT. And yet it has failed to break down the morales of the people of CHT. During more than a decade of struggle for national existance and self-determination, the Jana Samhati Samiti is inflicted heavy casualties on the Bangladesh forces. Hundreds of Bangladesh forces were killed in the hands of the Shanhati Bahini in clashes. The Party was on the way with its power of exerting massive pressure on the Bangladesh Government, at that moment there came a serious blow wich shook the party leadership and the whole party at the treachery of few power hungry conspirators within the party. In 1982, a few corrupted and inactive workers who could not keep pace with the changed situation and wearied of the movement, became prey to a conspiracy at home and outside to baffle the movement,

They wanted a quick solution of the political problem of CHT which is far away from the reality of the ground and very much irrational and mechanical. The conspirators being Bhabotosh Dewan (Giri), Priti Kumar Chakma (Prakash), Debajyoti Chakma (Deben) and Trivangil Dewan (Palash) were the gang leaders of the conspiracy and revolted against the party. They misguided a section of the workers and tried to usurp the leadership of the party even through armed means. As the suicidal civilwar goes on the dissidents were on the verge of loosing the battle when they approached for peace. For the greater interest of the nation and our party an agreement was reached with the dissidents on the principle of 'FORGIVE & FORGET' on lst Oct. 1983. But the traitors with their treacherous motive, in a surprise attack on the Tactical Head Quarters on 10th Novebmer, 1983 killed our beloved Party leader Manabendra Narayan Larma along with eight of his Co-workers. The noble death of M. N. Larma as it were, a rising Sun set before noon and a bright star has fallen from the sky of CHT. The posterity will pay homage to him as long as the history of the people of CHT exists for his greatest contribution to the moevment. The situation was at its worst after the death of M. N. Larma. Jyotirindra Bodhipriya Larma (Santu Larma) being founder member of the party and builder of Shanti Bahini took the leadership of the Party. The blood feud inner party struggle with the treacherous dissidents reached its highest peak. J. B. Larma who had been working as right hand of M. N. Larma took the helm of the party very courageously. It is due to his strong, farsighted and aboveall his dynamic leadership the civil war ended within a short period of time, The dissidents suffered serious defeat politically and militarily andfinding no other alternative and having made another conspiracy surrendered to the Bangladesh Government on 29th April, 1985 to give another blow to the movement. After the surrender of the dissidents, the movement for slf-determination seemed to get a new life from its impending death. The Jana Samhati Samiti is determined to reach its goal. By the unconditional surrender of the dissidents to the Bangladesh Government, it has been exposed to the people of CHT that it was the evil design of Bangladesh Government and plot in conspiracy with the gang leaders Bhabotosh, Priti Kumar, Debajyoti and Trivangil to destroy the movement for self-determination of CHT. The history shall not forgive them for their treachery to the nation, The dissidents would be thrown over as garbage in the history of CHT. The Jumma people of CHT have taken a lesson from these traitors who stabbed the nation from the back by killing our beloved leader, pioneer of our movement. The Jumma people and the party are determined to carry out the struggle till the achievement of self-determination for CHT under the dynamic leadership of J. B. Larma. The movement is spreading far and wide. Different Humanitarian organisations of the world such as—AMNESTY INTERNATIONAL, SURVIVAL INTERNATIONAL, ANTI-SLAVERY SOCIETY, INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF RECONCILIATION, BANGLADESH PEOPLES DEMOCRATIC MOVEMENT-(U. K.), THE HUMAN RIGHTS COMMISSION, U. N. O. HUMANITY PROTECTION FORUM (INDIA) and other humanitarian and freedom loving people of the world have become much vocal against the ruthless suppression and repression of the people of CHT. It is true that Bangladesh being the chairperson of the Human Rights Commission U. N. O. has lost a sense of justice and conscience. Bangladesh is trying to put down the movement for

self-determination in CHT and trampling down the humanity by killing thousands of innocent people indiscriminately. Therefore, in protecting the right of the indigenous people and to save them from total extermination pressures from home and abroad, from the U. N. O., and Humanitarian organisations pressures from different aiding countries should be exerted on Bangladesh Government to accept the justful demands of the people of CHT. The people of CHT make a fervent appeal to the world conscience for an urgent international (U. N. O.) intervention upon Bangladesh (a signatory to the international convention on elimination of all forms of racial discrimination signed on 4th January, 1969) which violates fundamental human rights in CHT by killing, arresting, raping, arsoning etc.

Without traversing into the root and deep problems of CHT, the political parties and the people of Bangladesh have termed the people of CHT as scessionists and hostile to Bangladesh Government. But the people of CHT never started a scessionist movement, They have been fighting against centuries old political, economic and socio-cultural problems. In fact, the political parties of Bangladesh have a role to play in bringing about a solution of the problem of CHT politically. Therefore, the people of CHT cherish and earnestly hope for a correct re-evaluation of the political deadlock regarding CHT by the political parties of Bangladesh through creating opinion and pressures so that Bangladesh Government may realise the justful political soultion of CHT is in the greater interest of the people of CHT alone.

Thirteen years ago the Jana Samhati Samiti which was formed on the principles of nationalism, Democracy, secularism and social justise, has shouldered the responsibility of achieving right of self-determination in CHT. It has gone through many ups and downs. It has overcome the darkful days of the civil war due to its strong and able leadership. The Bangladesh Government violates international obligations and fundamental human right. The Jumha people of CHT are but performing their historical responsibility against total extinction, Realisation for a political settlement of the problem of CHT and guaranteeing the rights constitutionally, self-determination to the Jumma people of CHT is the centuries old problem of CHT.

The history which is being written with the stain of blood of the Jumma people of CHT shall not wither away easily. The struggle for self-determination to safe guard the national existance and solidarity of the motherland of the Jumma people against the extreme Bengali Muslim nationalistic and Islamic Fanatic extremism of Bangladesh, shall continue unabated till the last drop of blood of the Jumma people of Chittagong Hill Tracts under the leadership of Jana Samhati Samiti.

১০ই নভেম্বর আমি দেখেছি

—শ্রীসৌরভ

১০ই নভেম্বর আমি দেখেছি—
দুর্যোগপূর্ণ রাতের অন্ধকারে, উদ্‌ভ্রান্ত ডাইনীর মত,
বুকে গ্রেনেড ও বুলেট আর হাতে অস্ত্র ধরে
সমঝোতার স্বস্তিপূর্ণ রাতে—
জ্যেষ্ঠভ্রাতা রিপনের বুকে প্রথম ব্রাশটি চালাতে।
মুহুর্মুহু এস এমজির ব্রাশ—একটানা দুই ম্যাগাজিন
শুধুমাত্র নেতাকে লক্ষ্য করে ; দৈত্যের খিচুনী দাঁতে,
বিকৃত গলায়—ইয়া আলী, ইয়া আলী করে—
আবুল্যা এডভান্স, এডভান্স কেন বলেছিলে ?
নেতাকে হত্যা করেছ নির্মমভাবে কিন্তু কি ছিল
তার অপরাধ ?
আজন্ম বেজাতির ক্লেশ সহে চেতনাহীন,
কর্ণধারহীন ক্ষয়িষ্ণু জাতির উন্মেষ ঘটিয়েছিল বলে ?
তাহলে—
তাহলে কি বড় সামন্তের মত দুর্যোগের দিনে
দেশান্তরী হলে ভালোই ছিল ? অথবা
মন্ত্রীত্ব নিয়ে ধানমণ্ডীর সুরম্য অট্টালিকায় গা ভাসালে
যথার্থ হতো ?
ধিক্কার তোমাদের বিবেক, জঘন্য তোদের বিচার।
তাইতো নিপাত যাচ্ছ তোমরা পরের ঘরে
গোলামী করে—আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে
অসহ মরণ যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করছ।
নইলে সেদিন—
সাক্ষী রেখে সমঝোতা পত্রে সই করতে না,
ক্ষমা চাইতে না নেতার কাছে ; পারতে না গুলি চালাতে
সেইসব নিষ্পাপ বিপ্লবীদের—শুভেন্দু আর রিপন
সৈকত আর জুনি ; তারাতো কোনদিন যুদ্ধেও যায় নি
তবুও তারা তোদের বিচারে অপরাধী ?
অপরাধী তারা—মণিময়, মিশুক, অর্জুন আর সৌমিত্রের
মত যারা দেশ মাতৃকার অস্তিত্ব রক্ষার শপথে
ছিল অটল ?
হে নরপিশাচ, কুলাঙ্গার ! মনে রেখো—
যে অসত্যের পথে ষড়যন্ত্রের আগুন জ্বালিয়েছে,
সে আগুনের বেষ্টনীতে বুনো ষাঁড়ের মতই
তোমরাও জ্বলবে—পুড়বে—মরবে।
কারণ—
তোমরা অসত্যের পথিক, বিভেদের কালোহাত,
ষড়যন্ত্রের হাতিহার আর বিকারগ্রস্থ মানুষের অপচ্ছায়া।
যেহেতু—
আমরাই দেখেছি ষড়যন্ত্রের নীল নক্‌শা
দেখেছি ক্ষমতা লোভের দীর্ঘশ্বাস আর
দেখেছি সেই ১০ই নভেম্বর—।
তোমরা কোনদিন আর পবিত্রতা ফিরে পাবে না ;
কারণ আমার সঙ্গীরা আর আমি দেখেছি
সেই কলঙ্কিত ইতিহাস আর ১০ই নভেম্বর।

—o—

কিছু কথা

—শ্রীনয়ন

আমি তখন একজন ছাত্র। পড়াশুনা করতাম বান্দর বন মহকুমা স্কুলে। বান্দরবন মহকুমা শহর হলেও বহির্জগৎ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। ব্যবসাবাণিজ্য ও তেমন নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর দপ্তর রাঙ্গামাটির সাথে সরাসরি কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চল সব দিক দিয়ে অনুন্নত। ফলতঃ কালে ভদ্রে এই ছোট মহকুমা শহর বান্দর বনে জন সমাগম হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কোনো জাতীয় অথবা বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের সময়ই এ পার্বত্য শহরে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এমনি এক উৎসবকে ঘিরেই কিছু কথা আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে চির জাগরুক হয়ে আছে যা পরবর্তীতে আমার জীবনের চলার পথের সন্ধান দিয়েছিল। সেই "কিছু কথা" দিয়েই আমি আজ প্রয়াতঃ নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও অন্যান্য দেশ প্রেমিক শহীদদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জুম্ম জনগণের জাতীয় উৎসবের মধ্যে রাজপুন্যাহ অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মং, বোমাং,—এ তিন সার্কেলে তিনজন রাজা। প্রতি বছরই প্রত্যেক রাজবাড়ীতে রাজ পুন্যাহ উৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবে দূর দূরান্ত থেকে শিশু যুব সহ হাজার হাজার নর নারীর সমাগম হয়। অনেক গন্যমান্য অতিথি সহ জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এ উৎসবে আমন্ত্রিত হন। এসময়ে হেডম্যানগণ সারা বছরের সংগৃহীত খাজানার অর্থ জমা দেন, রাজার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে রাজাও নেতৃবর্গ ভাষণ দেন। তাছাড়া উৎসবের দিন বিচিত্রানুষ্ঠান ও বেচা কেনার ধুম পড়ে যায়।

রীতি অনুযায়ী বান্দর বনের বোমাং রাজ বাড়ীতে ও প্রতি বছর এই রাজ পুন্যাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৭২ সালেও একই নিয়মে রাজপুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন ডিসেম্বর মাস। বহু দূর দূরান্তের চেনা অচেনা হাজার হাজার লোকে গোটা বান্দরবন শহর ভরে যায়। শহর বন্দর থেকে শতশত ব্যবসায়ী আসতে থাকে তাদের নিত্য নূতন সওদা নিয়ে। দিন রাত বেচা কেনা ও বিচিত্রানুষ্ঠান চলতে থাকে। আমন্ত্রিত অতিথিরাও আসতে থাকেন। এভাবে মূল অনুষ্ঠানের দিনটা এসে পড়ে। মূল অনুষ্ঠানের দিনে রাজা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানসূচী সম্বলিত ছাপা কাগজ সর্বত্র বিলি করা হয়। সাধারণতঃ অনুষ্ঠানসূচীতে যারা বক্তৃতা দেবেন তাদের নাম ও পরিচয় লেখা থাকে। সূচীতে এমন একজনের নাম উল্লেখ ছিল যাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমার খুবই একটা গোপন ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা আজ পূরণ হতে যাচ্ছে ভেবে আমি সত্যিই খুবই খুশী ও উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। তাই ভাবতে লাগলাম কিভাবে আমার আকাঙ্খিত মহান ব্যক্তিটির সাথে কথা বলার সুযোগ করে নেবো।

সুযোগ এসে গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের দায়িত্বভার আমার উপরে অর্পিত হ'ল। সাদরে দায়িত্বভার নিলাম। যথাসময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আমরা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মিলে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করলাম। এর পর আমরা বিশেষ অতিথিদের পাশেই বসে পড়ি। বসার পর পরই আমি অতিথিদের মধ্যে আমার আকাঙ্খিত ব্যক্তিকে খুঁজতে লাগলাম। আমার সৌভাগ্য যে—আমাকে যে আসনে বসতে বলা হয়েছিল দেখি ঠিক তারই পার্শ্বে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সুশ্রী ও গৌর বর্ণের একজন অতিথি উপবিষ্ট রয়েছেন। বিশেষ সূত্রে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অতিথির পরিচয় জেনে নিলাম। জানতে পারলাম—ইনিই আমার সেই আকাঙ্খিত মহান ব্যক্তিটি যাকে দেখার ও যার সাথে কথা বলার জন্য আমি এতটা উদগ্রীব ছিলাম। আমার এই আকাঙ্খিত ব্যক্তিটি হচ্ছেন—জুম্ম জাতির কর্ণধার, মহান বিপ্লবী ও জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা।

আমার হাবভাব দেখে প্রয়াত নেতা এম, এন, লারমা প্রথমে নিজেই আমার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। আমার পরিচয় জেনে নিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে উদ্বোধনী সংগীত সুন্দরভাবে পরিবেশনের জন্য প্রশংসা করলেন। নেতার ব্যবহারে ও কথায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। সেই অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়াত নেতা অনেক কথাই বলেছিলেন। তন্মধ্যে কিছু কথা আমার মানস পটে এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। সেদিন প্রয়াত নেতা অতি আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন—"দেখ নয়ন তুমি আজো ছাত্র। তোমার প্রধান দায়িত্ব মন দিয়ে লেখাপড়া

করা। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই এই লেখাপড়া একটা উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে হবে। দেশ জাতির স্বার্থটা রেখেই লেখাপড়া করতে হবে। দেশ ও জাতির কথা ভুলে গিয়ে লেখাপড়া করার কোন মূল্য নেই। তোমার বয়স খুবই কম; এ বয়সে তোমার পক্ষে সবকিছু বুঝা সম্ভবপর নয়। তাই আবারো বলি মন দিয়ে পড়—সুশিক্ষিত হও। তবেই তোমার জাতির দুঃখ দুর্দশার কথা বুঝে উঠতে সক্ষম হবে।" উনি যতই কথা বলতে থাকেন, ততই তাঁর প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হতে থাকে। তিনি বিশ্বে জাতির দুঃখ দুর্দশা ও মর্মবেদনার কথা বললেন। মুরুংদের সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ও পশ্চাৎপদতার কথা শোনালেন। তা ছাড়া অন্যান্য জুম্ম জাতিদের ব্যাপারেও আলাপ করলেন। একটু থানি থেমে তিনি আরো বলেছিলেন—"দেখ লেখাপড়ায় অবহেলা করো না। জ্ঞানার্জন কর। একদিন তোমাদের উপরই দায়িত্বভার অর্পিত হবে। জুম্ম জাতির প্রত্যেকটি শিক্ষিতকেই এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার আদায় করে নিতে হবে। আর তা যদি আদায় না করতে পারি—তাহলে আমাদের জুম্ম জাতির অস্তিত্ব থাকবেনা—জন্মভূমি হারাবো। দেখ—জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একতা শৃঙ্খলা রাখার উদ্দেশ্যে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি গঠিত হয়েছে। বান্দরবনে ও এই ছাত্র সমিতি আছে। এই সমিতিই তোমাদের মিলনকেন্দ্র হবে। এটাকে সম্মান দিও। এই সমিতির ফল খুবই উজ্জ্বল। এখন অনুভব করা যাবেনা। কেননা এটা রাজনীতির ব্যাপার। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিবর্তন করতেই হবে। কিন্তু এ পরিবর্তন এমনিতে হবে না। আমাদেরকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, পেরিয়ে যেতে হবে অনেক ঘাত প্রতিঘাত। যেমনি বাংলাদেশের বেলায় ঘটেছে বহু রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ তাদের অধিকার আদায় করেছে। তোমরা স্কুলে ইতিহাস পড়—ইতিহাস এভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রচিত হয়।" আমি উনার কথা যতই শুনছি ততই উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ছিলাম। দেখছিলাম—তার প্রতিটি কথাতেই কি এক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠে। তিনি বলতে থাকেন—"বাঙ্গালী মুসলমানেরা আমাদের জন্মভূমি ছারখার করে দেবে। আমাদেরকে বাঙ্গালী না করে ছাড়বে না—মুসলমান হতে হবে—অথবা জন্মভূমি ছাড়তে হবে। বাংলাদেশে থাকতে হলে জুম্ম জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে পারবো না। আমাদের সব জায়গা জমি জোর করে কেড়ে নেবে—সুতরাং সময় থাকতেই আমাদের সকল জুম্ম জাতির ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—এসবের প্রতিরোধ করতে হবে।" উনার কথা শেষ হতে না হতেই মাইকে ঘোষণা করে দেয়া হ'ল— এবারে এম পি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উনার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। উনার থেকে মূল্যবান কথা শোনার আর সুযোগ হলো না। তিনি স্বীয় আসন থেকে উঠে ধীরে ধীরে বক্তৃতা মঞ্চে চলে গেলেন। বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি দৃঢ়তা সহকারে অকুতোভয়, জুম্ম জনগণের দুঃখ দুর্দশা এবং সরকারের অত্যাচার উৎপীড়নের কথা তার বক্তব্যে তুলে ধরলেন। সর্বোপরি জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবীর কথা জোর কণ্ঠে জানালেন। উনার জ্বালাময়ী ও যুক্তি পূর্ণ ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলী জুম্ম জনগণের মধ্যে বেশ উত্তেজিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, তাঁর বক্তৃতা শ্রবনে একদিকে আমি কেমন যেন একটা সংগ্রামী মনোভাব অনুভব করতে থাকি আর অপর দিকে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও গভীর হয়ে উঠে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। সবাই একে একে চলে যেতে থাকে। আমার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিও চলে যেতে উদ্যত হলেন। যাবার আগে শুধু আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন—"দেখ নয়ন আমার কথাগুলো মনে রেখো, মন দিয়ে লেখা পড়া করো।" তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি শ্রদ্ধাভরে উনাকে সেদিন বিদায় দিলাম। যতদূর দেখা যায় উনার গমন পথের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে ছিলাম। শুধু আমি নই—উপস্থিত বিপুল জনতাও শ্রদ্ধাচিত্তে উনাকে বিদায় দিলেন।

আজ ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সাল। আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত মহান ব্যক্তিটির দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই মহান ব্যক্তির মহামূল্যবান জীবনের অবসান হলেও তাঁর নীতি আদর্শ নিহত হয়নি। নিহত হয়নি সেই "কিছু কথা", যা জাতীয় কর্ণধার মহান নেতা আমাকে ১৯৭২ সালে বান্দরবন বোমাং রাজ পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে বলেছিলেন।

"কিছু কথা" আমার জীবনের দিক নির্দেশক। "কিছু কথা" আমাকে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে। "কিছু কথা" আমাকে সংগ্রামী সাহসী ও ত্যাগী করে তুলেছে। "কিছু কথা" অমর হোক।

আমার চোখে মানবেন্দ্র লারমা

—শ্রীবেণী

"আমরা সর্বহারা—আমাদের অহঙ্কার করার মত কিছুই নেই।"

—এম, এন, লারমা

সম্ভবতঃ ১৯৭৮ সাল দিন তারিখ স্মরণে আসছে না। কোন এক জরুরী কাজে আমার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ পাঠানো হয়েছিল। কেন্দ্রে এই আমার প্রথম আগমন। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে পড়ন্ত বেলায় যখন পৌঁছি, তখন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভীষণ ব্যস্ততা। দেখলাম সবাইয়ের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। কারণ ব্যারাকে একজন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমাদেরকে অবশ্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। কিন্তু ব্যারাকের অন্যান্যদের মত আমরাও উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারলাম না। তাই অসুস্থ সহকর্মীকে একটু দেখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম রোগীর পাশে কয়েকজন কর্মী উপবিষ্ট। সবাই রোগীর সেবা কাজে ব্যস্ত। তন্মধ্যে সুশ্রী গৌরবর্ণ ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজনকে বেশী ব্যস্ত বলে মনে হলো। যারা রোগীর সেবায় নিয়োজিত তাদের কাউকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। সেই সুন্দর সুবুরুষ কর্মীটি থার্মোমিটারে রোগীর তাপমাত্রা দেখলেন, সাথে সাথে ইউনিটের ডাক্তারকে ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র তাড়াতাড়ি করে দিতে পরামর্শ দিলেন। তারপর রোগীকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে একটা বাসন এনে পরিষ্কার করে ধুইয়ে তারমধ্যে ঔষধ ও থার্মোমিটারটা রেখে দিলেন। আর রোগীর কপালে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অসুস্থ বন্ধুকে ঘুমাবার চেষ্টা করতে বললেন। সহকর্মীর প্রতি এত দরদ ও সহানুভূতি দেখে আমার মনে বড়ই কৌতুহল জাগল। তাই এই সুন্দর ও সহানুভূতিশীল বন্ধুর পরিচয় জিজ্ঞাসা না করে আর থাকতে পারলাম না। জানতে পারলাম ইনি আর কেউ নন, ইনি হলেন ছয় লক্ষাধিক জুম্ম জাতির কর্ণধার, জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, পার্টি প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (মন্তু)। পরিচয় জেনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। পার্টির সর্বোচ্চ ব্যক্তি হয়েও সাধারণ একজন ভলান্টিয়ারের (শান্তিবাহিনীর সদস্যের) জন্য এত পরিশ্রম করে সেবা শুশ্রূষা করে যাচ্ছেন। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাঁর প্রতি আমার মাথা নত হয়ে এলো। ভাবলাম তারমধ্যে এতবড় মহৎ প্রাণ আছে বলেই আজ সমগ্র জুম্ম জাতিকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছেন। ধন্য জনসংহতি সমিতি, ধন্য জুম্ম জাতি।

আজ ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইংরেজী। আজ মহান নেতার মহা প্রস্থানের দিন। ঘুরে ফিরে মনে পড়েছে সেদিনের সেই অতি ব্যস্ত শুশ্রূষাকারী মহান নেতার উদ্বিগ্ন মুখখানা। যিনি আজীবন সহযোদ্ধা ও কর্মীদের রোগে শোকে পরম সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দিয়ে গেছেন। একজন সহকর্মী রোগে আক্রান্ত হলে তার রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত যার ব্যস্ততা ও উদ্বিগ্নতার সীমা থাকতো না, যিনি মায়ের স্নেহ ও বোনের ভালবাসা দিয়ে বছরকে বছর ধরে সহকর্মীদেরকে নিয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এগিয়ে এনেছেন—সেই মহান ব্যক্তি তার কঠিন মৃত্যুশয্যায় পেলো না কোন সেবা শুশ্রূষা, মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁর চতুর্পার্শে ছিল শুধুমাত্র কুচক্রীদের হিংসার উন্মত্ততা। এটা নিশ্চয় জাতির দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আজ এই শোকাবহ দিনে জাতির কর্ণধার ও অন্যান্য শহীদদের স্মরণ করছি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে।

প্রথম দর্শনে যার প্রতি আমার মাথা নত হয়েছিল সেই আমাদের বরণীয় নেতার গুণাবলী সম্পর্কে পরে অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল। কারণ এরপর থেকে কেন্দ্রে আমাদের আসা যাওয়া হতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বদলী হওয়াতে প্রায়ই নেতাকে অতি কাছের থেকে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ছিলেন অনেক মহৎ গুণের অধিকারী। তাঁর মন প্রাণ কঠোরতা ও কোমলতা—এই দুই এর সংমিশ্রনে গঠিত ছিল। তিনি শাসক শোষক গোষ্ঠীর প্রতি যেমনি ছিলেন কঠোর ও আপোষহীন, তেমনি নির্যাতীত, নিপীড়িত জাতি ও মানুষের প্রতি ছিলেন পরম দরদী ও সহমর্মী। তাঁর দেশপ্রেম ছিল দেশ কালের ঊর্দ্ধে। তিনি ত্যাগী, মিতব্যয়ী, সাহসী, সংযমী, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল উদ্যোগী ও দৃঢ় মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি পরোপকারী ও সহানুভূতিশীল গরীবের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল সাধারণের ঊর্দ্ধে। তিনি সৎ ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। নিয়মিতভাবে তিনি

পড়াশুনা করতেন। পরিষ্কারভাবে না বুঝা পর্যন্ত তিনি যে কোন বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে অভ্যস্থ ছিলেন। যে কোন কঠিন বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেবার দক্ষতা ছিল তাঁর আর একটি অন্যতম গুণ। তিনি খুবই চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁর একটা শিল্পী মন ছিল। তিনি সংস্কৃতিবান। জুম্ম সংস্কৃতি উন্নতি সাধনে তাঁর একাগ্র ইচ্ছা ছিল। রাজনীতির প্রজ্ঞায় ছিলেন অগ্রগামী। বিপ্লবী চেতনায় ও মানসিকতায় সমৃদ্ধ এই রাজনীতিবিদের সামরিক ক্ষেত্রেও ছিল অগাধ জ্ঞান। তাঁর উদ্ভাবিত সমরনীতি ও কৌশল আজ জনসংহতি সমিতির শান্তিবাহিনীর বীর সদস্যরা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মনে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তিনি একজন অসামান্য দূরদর্শীও ছিলেন। তাঁর দূরদর্শীতায় জুম্ম জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ ও অধিকার সচেতন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর দূরদর্শীতার স্বাক্ষর বহন করেছে।

মানবতাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি আমৃত্যু মানবতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাই তাঁর অন্তর দয়া, করুণা ও ক্ষমাশীলতায় পরিপূর্ণ ছিল। শুধু মানুষের প্রতি নয় তিনি সকল জীবের প্রতিও দয়ালু ছিলেন। তিনি প্রকৃতি প্রেমিক, প্রকৃতির অপার-মহিমা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে থাকতেন।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁর সংস্পর্শে একনাগাড়ে আমার বেশ কয়েকটি বছর অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হয়েছে। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও আমার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। কিন্তু এতবড় মহান ব্যক্তির সম্পন্ন জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে ফুটিয়ে তোলা আমার মত একজন অনুরাগীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবুও কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নেতার গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হয়।

গরীব চাষী ও ভূমিহীন তথা সমাজে যারা সবচেয়ে গরীব ও অসহায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাদের সকলের প্রতি মহান নেতা এম, এন লারমা ছিলেন সবচেয়ে দরদী। দেশে যখন খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন দেখেছি তাঁর মনে কি যেন একটা বেদনা যা বরাবরই তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে রাখত। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করতেন যাতে গরীব লোকেরা যার সংস্থানের একটা উপায় বের করে নিতে সক্ষম হয়। তাই দেখেছি আমরা যেখানে যাই যে এলাকায় অবস্থান করি, সে স্থানেও সে এলাকার সর্বহারা গরীবদের জন্য কিছু কিছু সাহায্য দিতে। কেউ বাইরের দারিদ্র সম্পাদন করে ব্যারাকে ফিরে গেলে সাধারণ মানুষের অবস্থা খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। জনগণের দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যার সম্বন্ধে জেনে নিয়ে যথাসম্ভব পার্টির সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিকট নির্দেশ পাঠিয়ে দিতেন। যেমন যাদের বীজ-ধান সংগ্রহ করার ক্ষমতা নেই তাদের জন্য বীজধান কিনে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিতেন।

জুম চাষীদের জীবনের ইতিহাসতো আরও করুণ। বৎসরে মাত্র একবার চাষ করে। ৬/৭ মাসের মধ্যে খোরাকী শেষ হয়ে যায়। তুলা, তিল, ও জুমের অন্যান্য উৎপাদিত শস্যাদি বিক্রয়েও আর কত টাকা পাওয়া যায়। বাকী ৫/৬ মাস প্রায় অভাবের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। জুম চাষের সময় চাষীর বীজধানও থাকে না। কখনও অনেকেই আলু খেয়ে কোন রকমে চাষ করে থাকেন। এইসব কথা নেতার অজানা ছিল না। তাই জুমচাষীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি রাখতে বরাবরই আমাদের সবাইকে পরামর্শ দিতেন অথবা স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সম্ভবতঃ এপ্রিল মাস। জুম পোড়া শেষ হয়েছে। যাদের একটু সামর্থ্য রয়েছে তারা জুম ধান বপনের কাজ শেষ করেছে। কিন্তু যারা খুবই গরীব তাদের ধান বপন করা সম্ভব হয়নি। আমাদের ব্যারাকের অনতি দূরে একটা জুম ছিল। সেদিন সেই জুমের উপর দিয়ে প্রয়াত নেতাকে বাহিরে এক জায়গায় যেতে হবে। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য জায়গায় জায়গায় লোক রাখা হয়। তাই একটু নিশ্চিন্তে পড়ন্ত বেলায় আমরা জুমের পথ বেয়ে চলেছি। চলার পথ থেকে জুমের নীচে সাদা শরীরে কালি মাখা একজন লোককে কাজ করতে দেখা গেল। এ জুম চাষীটি হলো একজন ত্রিপুরা। তখন তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন—দেখ একজন লোক জুমের আগাছা পরিষ্কার করতেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় আর কিছুক্ষণ কাজ করে। মনে হয় শরীরের দুর্বলতার কারণে কিছুক্ষণ কাজ করে এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। আমরাও সবাই দেখলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"ভাতের অভাবে মনে হয় তাকে এমন দেখাচ্ছে। তুমি যাও তাকে কিছু দিয়ে এসো।" তখন তাঁর রুকসেক নামিয়ে আমাকে ৩০০ (তিনশত) টাকা দিয়ে দিলেন। আরও বললেন পরে অসুবিধায় পড়লে যেন সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। আমি তখন তাঁর দেওয়া টাকা দিয়ে লোকটার নিকট গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রথমে হাতিয়ার কাঁধে অবস্থায় দেখে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তার সাথে আলাপ করার পর তার ভয় দূরীভূত হলো। দেখলাম তার শরীরের অবস্থা। বুকের হার পর্যন্ত গোনা যায়। পরনে শার্ট নেই। শুধু একটা নেংটি লজ্জানিবারনের জন্য। তখন তাকে বুঝায়ে তিনশত টাকা দিয়ে দিলাম। লোকটি বললেন—"দাদা, এ বছর তো টাকা পরিশোধ করতে পারবোনা"। আমি বললাম পরিশোধ করতে হবেনা। অসুবিধায় পড়লে যোগাযোগ করো বলে আমি ফিরে আসলাম। তখন জুম চাষীটি অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাকে নমস্কার জানালো। কিন্তু সে বুঝলোনা এটা কার দয়া?

শুধু তা নয়। একবার এক জুমিয়া চাষীকেও নিজের পরিশ্রম দিয়ে প্রয়াত নেতা সাহায্য করেছিলেন। তখন ১৯৭৮ সাল। আমরা একটা জুমে সাময়িক কালের জন্য অবস্থান করছিলাম। জুম চাষীটি নেতাকে চিনতেন না। জুমে তখনও পর্য্যন্ত অনেক কাজ বাকী। তাই জুম চাষীকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কথাতে আমরা জুমের কাজে লেগে গেলাম। প্রত্যেকদিন আমরা প্রয়াত নেতাসহ উঁচু পাহাড় বেয়ে পিঠে ঝুড়ি নিয়ে তিল সংগ্রহের কাজে সাহায্য করতাম। এভাবে আমরা যতদিন ছিলাম ততদিন এই গরীব জুম চাষীর উপকার করতে সচেষ্ট ছিলাম।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড একথাটা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর শিক্ষকতা জীবনে তিনি এদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরনে ও শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। যতদিন তিনি শিক্ষকতা করেছেন ততদিন গরীব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে সর্বপ্রকারের সাহায্য দিয়ে এসেছেন। বিভেদপন্থী চার কুচক্রীর অন্যতম হোতা পলাশের মত অনেক গরীব ছাত্রকে তিনি উদারহস্তে সাহায্য করেছেন।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির সার্বক্ষনিক কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা স্বল্প শিক্ষিত। তিনি এদেরকে নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। তাই তিনি দলীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এসব নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত সহকর্মীদের জন্য পার্টিতে লেখাপড়া করার ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি হাজারো কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সহকর্মীদের লেখাপড়া শেখাতেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি রাজনীতির ক্লাশ ও পরিচালনা করতেন। তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেক কর্মী বিভিন্ন স্থানে আজও দলীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডার সবাইয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখতেন। তিনি যা জানতেন তাই অপরকে দিতে বরাবরই সচেষ্ট থাকতেন। তজ্জন্য তিনি বছরের পর বছর পরিশ্রমও করে গেছেন।

তিনি যে একজন সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন তা জানতে পারি যখন তিনি মধুর সুরে বাঁশী বাজাতেন। একদিন আমাকে বাঁশী বাজাতে দেখে ডেকে বললেন—"দেখ তোমরা যদি বাঁশী বাজানো শিখতে চাও তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি।" এভাবে তিনি বাঁশী বাজানোর ক্লাশও নিতে থাকেন। হায়রে আজ তাঁর সেই মন মাতানো বাঁশীর সুর শোনা যাবেনা, শোনা যাবে না তার সেই অনলবর্ষী বক্তৃতাও।

তিনি প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। বনের বাঁশ গাছ ও পশুপক্ষী সংরক্ষনের প্রতিও ছিলেন খুবই সংবেদনশীল। আমাদের প্রায় সময়ই স্থান পরিবর্তন করে নূতন ব্যারাক তৈরী করতে হতো তাই কোন সময় নূতন ব্যারাক করতে হলে অনেক বাঁশ গাছ কাটতে হতো। তখন তিনি নির্দেশ দিতেন যাতে অপ্রয়োজনীয় বাঁশ গাছ কাটা না হয়। তিনি বলতেন যে, এসব আমাদের জাতীয় সম্পদ, তাছাড়া বাঁশ গাছ প্রকৃতির শোভা যেমনি বৃদ্ধি করে, তেমনি আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্যতা রক্ষা করে। তাই কোন কারনে জঙ্গলে ঘুরতে গেলে বাঁশ গাছ অহেতুক না কাটার জন্যে ও বারন করতেন।

বনের পশু রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বড়ই কড়া। তাই কয়েক প্রকার বনের পশুপক্ষী বধ করা ছিল নিষিদ্ধ। এটা সমগ্র দেশে পার্টিগতভাবে নির্দেশজারী করা আছে। একটা আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলি প্রয়াত নেতা যে ব্যারাকে থাকতেন সে ব্যারাকের নীচে ঠিক তাঁর বিছানা বরাবর একটা বিষধর সাপ যে থাকতো তা আমরা জানতাম না। ব্যারাকের চতুপার্শ্ব পরিষ্কার করতে গিয়ে ঐ সাপটা আমাদের চোখে পড়ে। আমরা সাপটাকে মারার জন্য উদ্যত হলে তিনি বারন করলেন। বললেন—সাপটা কাকে ও যখন ক্ষতি করেনা অনর্থক মারবে কেন? সাপটি দেখানেই রয়ে গেল। অথচ তাঁর কোন ক্ষতিই করলোনা। আমরা অবশ্য এজন্য শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। শুধু সাপটি নয়, একটি পাখী ও আসতো তার নিকটে। এক রুকসেক হইতে আর ও এক রুকসেকে পাখীটি ঘুরে ঘুরে থাকতো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পাখীটি তার জায়গায় চলে যেতো। তিনি সেই পাখীটিকে প্রতিদিন খাবার দিতেন। আমরা পাখীটিকে ধরার চেষ্টা করলে তিনি বারন করতেন। শুধু পশুপক্ষী নয় কীট পতঙ্গের প্রতি তিনি দয়ালু ছিলেন। কোন কীট পতঙ্গ যদি অসহায় হয়ে পরে থাকে তাহলে তিনি সেটা তুলে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিতেন। শুধু তাই নয় ব্যারাকের ঘাটে যেসব কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ থাকতো, সেগুলোকে তিনি খাবার দিতেন এবং না মারার জন্য বলতেন।

একটা ঘটনার কথা বললে আরো ভালভাবে জানা যাবে, তিনি পশুপক্ষীর প্রতি কিরকম দয়ালু আর তাদের সংরক্ষনের জন্যে কি রকম উদ্যোগী ও সচেষ্ট ছিলেন—১৯৭৯ সাল। অরন্যে ব্যারাক করেছি। বাঘ- ভালুক, হরিণ ও অন্যান্য প্রানীরা ছিল আমাদের প্রতিবেশী। ব্যারাকের অনতিদূরে ছিল জুম। একজন জুম চাষী জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপরে একটা কচ্ছপ পেয়েছিল। লোকটি কচ্ছপটি বিক্রি করতে যাবে এমন মুহূর্তে আমাদের ব্যারাকের একজন সেখানে উপস্থিত হয়। কচ্ছপটি দরাদরি করে ব্যারাকে

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এগিয়ে যাবেই

—দেবাশীষ

২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৫ সন, জনাকীর্ণ রাঙ্গামাটি ষ্টেডিয়াম। বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীদের এই দিন জাঁক জমক অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সদল বলে আত্মসমর্পণ করে। পরিসমাপ্তি ঘটলো গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের সৃষ্ট দুই বছরের আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের; বন্ধ হলো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জুম্মজাতির জন্য এটা একটা শুভ সংবাদ। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একদিকে একটা কালো অধ্যায়ের যবনিকা, অপর দিকে সমগ্র কর্মীবাহিনী ও পার্টি নেতৃত্বের অগ্নি পরীক্ষার সমাপ্তি ও আদর্শগত বিজয়। বলা বাহুল্য এই রক্তাক্তময় গৃহযুদ্ধের আন্দোলনের গতিমন্থর হয়ে পড়ে। কর্মীবাহিনীকে সংগ্রাম করতে হয়েছে সীমাহীন প্রতিকূলতার মধ্যে, হারাতে হয়েছে অনেক প্রাণ প্রতিম সংগ্রামী সহ যোদ্ধাকে। সর্বগ্রাসী এই যুদ্ধের প্রারম্ভিক কাল থেকে পরিসমাপ্তি কাল পর্যন্ত জাতিকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অধিকার সচেতন জনগণের প্রেরণা ও সংগ্রামী মনোভাব, আদর্শবান কর্মীবাহিনীর অদম্য কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগ শক্তি; দূর দৃষ্টি সম্পন্ন সুযোগ্য নেতার নিভুল পরিচালনায় আন্দোলনের পথে যে সর্ব প্রকার বাধা বিঘ্নকে পরাস্ত ও ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করা যায় তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে যাবে এই গৃহযুদ্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রমান করেছে নিরীহ, সরল ও শান্তিপ্রিয় জুম্মজনগণ নিজেদের স্বার্থে আঘাত না আসলে কোন দিন বিদ্রোহ করেনি। বৃটিশ শাসনামলে কার্পাস দ্বারা রাজস্ব দিত জুমিয়া প্রজারা। এই কার্পাস রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার ফরিয়াদের (Speculators) কাছে এই কার্পাস মহল ইজারা দিত। ইজারাদারদের দ্বারা এলাকার অধিবাসীরা নিদারুণভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হত। এই শোষণ ও নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিরুপায় জুম্ম জনগন ১৭৭২ সালে বিদ্রোহ করে। বৃটিশ সরকারের সময়োচিত তদন্তে বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণ সমূহ নিরূপিত হয় এবং চুক্তির মাধ্যমে বিদ্রোহের অবসান হয়। দীর্ঘ একশত তিরাশি বছরের মধ্যে এতবড় বিদ্রোহ আর ঘটেনি। সত্তর দশকের গোড়ায় জুম্ম জনগণের ভেতর আবার সেই সশস্ত্র আন্দোলনের জন্ম নিয়েছে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্ম ভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের কারণে। এদেশের শাসক গোষ্ঠীর শোষন, নির্যাতন ও নিপীড়ন জুম্ম জনগণকে পুনরায় ঠেলে দেয়া হয় বিদ্রোহের পথে। এবারের সশস্ত্র আন্দোলনকে আরো বেশী বৈশিষ্টময় ও তাৎপর্য পূর্ণ করে তুলে শেখ মুজিবর রহমানের জাত্যাভিমান স্ফুলঙ্গ বক্তব্যে। তিনি ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে রাঙ্গামাটি শহরে কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে বলেছিলেন, "বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙ্গালী"। তাঁর একটিমাত্র বাক্যবানে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অগ্রপথিক মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা অনল বর্ষী ভাষায় সংসদে এর প্রতিবাদ করলেন। এর পরে শেখ মুজিবর রহমান তাঁর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ এর মাধ্যমে মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দেখায়ে সংসদ সদস্য এম,এন লারমাকে নিবৃত্ত করতে না পেরে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে শাসালেন "পার্বত্য চট্টগ্রামে চার ডিভিশন সৈন্য পাঠাবো। লারমা, তোমাদের বাসী যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবো, দশলাখ বাঙ্গালী ঢুকিয়ে দেবো।" বাঙ্গালী জাতির জনক ও একজন সরকার প্রধানের এহেন উক্তিতে তাদের রাজনৈতিক আন্তঃ মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে না। উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিকারী আওয়ামী লীগ সরকারের আগ্রাসন নীতি ও বিরোধী দলগুলোর সংকীর্ণ মনোভাব এবং পরিশেষে তাদের অস্তিত্বহীনতা সংসদীয় পথে স্বায়ত্ব শাসনের দাবী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিক্ষোভের উন্মুখ পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। সে সময়ে সংগ্রামের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সশস্ত্র সংগ্রাম। সংসদীয় বাকবিতণ্ডা নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের অপরিণামদর্শী নেতৃত্বই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রিয় জুম্ম জনগণের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

১৯৭৬ সন। শুরু হলো সশস্ত্র বিদ্রোহ। নির্ধারিত হয়ে গেল সংগ্রামের পথ। সমাগত কর্মী সম্মেলনে সশস্ত্র আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হলো। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে মোহগ্রস্থ কিছুসংখ্যক পরিচালক কর্মী এই কর্মসূচী আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে

পারলো না। আবার বাস্তবমুখী অবস্থার কারণে এড়িয়ে যাবার ও যো ছিল না। তখন থেকেই ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা প্রণীত হতে থাকে। তাদের মধ্যে অন্যতম পরিচালক কর্মী প্রকাশ তখনও শিক্ষকতা নিয়ে তালবাহানায় ব্যস্ত। ভাবখানা লক্ষিন্দরের, কাজে নন্দলাল। কর্মী মহলের চাপেও গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে ১৯৭৭ সালে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে যোগ দিলেও প্রকাশ সক্রিয় উদ্যোগী হতে পারলো না। ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী নানাভাবে ভণ্ডুল করে দিতে সচেষ্ট থাকে। অপরদিকে দেবেন গোড়ার কর্মী হলেও সশস্ত্র সংগ্রাম বিরোধীদের এক নম্বর শয়তান। দুই-একটা এ্যাম্বুশের পরিকল্পনা নিয়েই বসে গেল জেনারেল। পণ্ডিত মন্য-ভাব নিয়ে কেন্দ্রে রচিত সমরনীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে, যেন সে আরো একটা রণনীতি বিজ্ঞান প্রণয়ন করবে। আস্ফালন করতে থাকে আরো অস্ত্রশক্তির অপ্রতুলতার অজুহাত প্রদর্শন করে। বাড়তি শক্তি দিয়েও দেবেন স্বীয় সেক্টরে কোন যুদ্ধই পরিচালনা করতে সক্ষম হলো না। শেষ পর্যন্ত ফেনী এলাকায় মাঝ পথে রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে বাহিনীটাকে উদ্যোগহীন করে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাড়ীতে চলে আসে। অথচ এই চক্রান্তকারী দেবেনের নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে উৎসাহের অন্ত ছিলো না। নিম্নস্তরের কর্মীদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের তথাকথিত একশ চব্বিশ প্রকার বাব শিখানোর আড়ালে ছিল হীন অভিলাস। সশস্ত্র আন্দোলন বিমুখ মনোভাব উর্ধগতি করার লক্ষ্যে কায়দা করে কর্মীদের বৈষয়িক মুখী করে তোলে। প্রকাশ-দেবেনের ভাবাদর্শের শিষ্য পলাশের ভূমিকা আরো বেশী দুঃখ ও লজ্জার জনক। সর্ষের ভিতরকার ভূত সেজে ভুতুরে কাণ্ডকারখানা করে তুলেছিলো বিশ সেক্টর। দেখে নিরাপত্তার জিগির তুলে সমস্ত সামরিক কার্যক্রম ফাইলবন্দী করে রাখে। বিশেষ সেক্টরকে ডিমের ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলো যেন একটু নাড়া চাড়া করলে ভেঙ্গে যাবে। কেন্দ্রের নয়নের তলে বসে কেন্দ্রের রচিত সর্বপ্রকার নীতিগত প্রশ্নে বিরোধিতা করতে পিছপা থাকলো না। পার্টির অভ্যন্তরে এরূপ একটা স্ববিরোধী অভ্যন্তরীণ পরিবেশে কর্মী সম্মেলন বসে। প্রকাশ-দেবেনদের সক্রিয় উদ্যোগী ও কর্তব্য সচেতন করার লক্ষ্যে পলাশকেও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করে নেওয়া হয়। এতে অবস্থার পরিবর্তন আসলো না, বরং তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের প্রশ্রয় দেওয়া হলো। গুজনে ভারী, ধারে ভোঁতা রয়ে গেলো। ঘোরতর লড়াইয়ের দিনগুলোতে প্রকাশ ও দেবেন চক্রের নিষ্ক্রিয় ও উদ্যোগহীনতা পলাশীর যুদ্ধ-ভূমিতে মীর জাফরের লড়াই না করার উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকাশ দেবেন-পলাশ এই তিন রাহুর সাথে আরেক রাহু গিরির অশুভ মিলনই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত ইতিহাস রচিত হয়।

অপরদিকে বাংলা দেশ সরকার জুম্ম জনগনের এই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন বানচালের প্রচেষ্টায় আদাজল খেয়ে লেগে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সামরিক ছাউনী গুলো সৈন্যে ভরে গেল। হাজার হাজার সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে একটার পর একটা দমন অভিযান ও অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকে। হত্যা, ধর্ষন, নির্যাতন, নিপীড়ন জনজীবনে নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাড়ায়। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস লীলায় পরিনত হয়। পালিয়ে যেতে অক্ষম বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়। সরকারের পোড়ামাটি নীতির সাথে চলতে থাকে হাজার হাজার সমতল অধিবাসী বাঙ্গালী মুসলমানদের বে-আইনী পুনর্বাসনের হীনতৎপরতা। বে আইনী পঙ্গপালদের জমি বেদখলের ফলে হাজার হাজার জুম্ম নরনারী বাস্তুভিটা ছাড়া হয়ে ভবঘুরে জীবন যাপন করতে থাকে। ঠিক এমনি সময়ে সরকারের উচ্ছিষ্ট খাওয়া দালাল, সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সমন্বয়ে ট্রাইবেল কনভেনশন গঠন করা হয়। পার্টির সক্রিয় উদ্যোগী পরিচালক ও সাধারণ কর্মীরা পর্যায়ক্রমে নিপুনতার সহিত সমগ্রদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভিযান ব্যর্থকরে দিতে লাগলো। পাল্টা যুদ্ধভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নাজেহাল অবস্থা করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখলো। দীর্ঘসাত বছরের যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মনোবল ঝিমিয়ে আসে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের মনে উপলব্ধির রেখাপাত করে অসম-শক্তির সংঘর্ষগুলো। এবং এ বদ্ধমূল ধারনার জন্ম দেয় যে এ সংঘর্ষ শেষ হবার নয়, এই শক্তি ধ্বংস হবার নয়। জেনারেল মঞ্জুর প্রতিবাদ করলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক, সামরিক ব্যবস্থার সমাধান করা সম্ভব হবে না।" অন্তর্বিরোধ জাগে ফৌজিশাসক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে। পরিণতিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। নিহত হয় জিয়াউর রহমান। তার আবির্ভাব ও অন্তর্ধান হয় একই পদ্ধতিতে। নূতন শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। গতানুগতিক পরিকল্পনা গুলোর সাথে সংযোজিত হয় কূট কৌশলের। পার্টির ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করা আন্দোলনের পশ্চাদভাগে ছুরিকাঘাত করা। এন. এস. আই এর ষড়যন্ত্রের ভিত মজবুত করলো আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্র। যথারীতি টোপ ফেলা হয়। অবৈধ প্রেম লীলায় মত্ত গিরি আন্তর্জাতিক চারনভূমিতে বিচরণ করতে গিয়ে টোপ গিলে ফেলে। আবাদ পেল কালো টাকার, হস্তগত হয় কোরান সদৃশ মুক্তির দিশারী লিখিত পাণ্ডুলিপি স্বপ্নতন রাজ্যের নীল নকসা। গাঁট ছড়া বাধলো প্রকাশ-দেবেনের ষড়যন্ত্রের সাথে।

পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে ষড়যন্ত্রের রূপরেখা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে উঠে। দেশী বিদেশী গুপ্তচর চক্রের উচ্ছসিত প্রশংসায়

গিরি চরিত্র ভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হয়। এবং পার্টির সর্বোচ্চ পদটি দখলে লোভ সংবরণ করতে না পেরে ষড়যন্ত্রের জালে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। অহংকারে মদমত্ত হয়ে আত্ম প্রচারে লিপ্ত হয়। নিষ্ক্রিয় উদ্যোগহীন কর্মীর মুখপাত্র প্রকাশ-দেবেন-পলাশ-চক্র গিরির পাশে এসে দাঁড়ায়। কক্ষপথ ভিন্ন হলেও আবর্তনের পথে এরা এক সময় পরস্পরের পাশাপাশি ও কাছাকাছি হয়। এদের অশুভ মিলনে আন্দোলনের কর্মপরিমণ্ডলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশচক্র ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রের বিদেশে সংগোপনে বৈঠকে বসে উপদলীয় ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ রোপিত হয়। উপদলে কেউ প্রধান, কেউ সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হয়; উপদেষ্টার পদে আসীন হলো আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রের প্রতিনিধি। শেখানো শ্লোগান ও বুলি মুখস্ত ও কণ্ঠস্থ করে চক্রান্তের হোতারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। প্রকাশ-দেবেন পলাশ পথভ্রষ্ট অনুগামীদের দীক্ষিত করলো উপদলীয় ষড়যন্ত্রের মন্ত্রে। বললো, "পুরোনো নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আসবেনা; নেতৃত্বের পরিবর্তন করতে হবে; দীর্ঘস্থায়ী নয় দ্রুত নিষ্পত্তি নীতিই হবে সকল কাজের দিক নির্দেশক নীতি।" "বাবী" নাম ধারণ করে জন সমক্ষে অবতীর্ণ হলো পঞ্চম বাহিনীর দিকপালরা। দেশ ব্যাপী জনসভায় "বাবী" শ্লোগানে উদ্বেলিত হলেন, অপপ্রচারের স্রোতে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবর্তনশীল অংশ সেই সাথে সক্রিয় উদ্যোগী কর্মীর কিছু সংখ্যক দিকভ্রান্ত হয়ে আবেগে ভেসে যায়। ফলে উপদলীয় চক্রান্তের হোতারা মনে জোর পেল। ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ সদ্ব্যবহার করলো। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সময়োচিতভাবে উপদলীয় সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আন্তরিকতার সহিত উদ্যোগ নিলেন।

১৯৮২ সনে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপদলীয় চেলা চামুণ্ডারা হাতে অস্ত্র নিয়ে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। দুষ্ট অভিসন্ধি ছিল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দুই প্রধান এম এন লারমা ও সন্তু লারমাকে হত্যা করে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখল করা। কুৎসা বর্ষণ করতে থাকে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কানে কানে প্রয়াত নেতা ও নেতৃবর্গের সম্বন্ধে। এযেন সাফ কাপড়ে কালি সিঞ্চন। কিন্তু, কিন্তু বুমেরাং হলো চক্রান্তকারীদের অশালীন, অমার্জিত ও উদ্ভট আচরণ; কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধির সামনে রহস্য জাল উন্মোচিত হলে আন্তরিক সমর্থন কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের অনুকূলে চলে যায়। বিপদের গন্ধ পেল বেঈমান গিরি প্রকাশ-দেবেন-পলাশচক্র। অবস্থা বৃদ্ধে বেগতিক মনে হওয়ায় বিভিসনের বহুরূপী কৌশল অবলম্বন করে। ঐক্যের দেবদূত সেজে বলে, "আমরা দেশ জাত ভালবাসি, পার্টির ঐক্য আমাদের কাম্য।" প্রতিনিধিগন সাধুবাদ দিলেন সম্মেলন সমাপ্ত হলো— প্রতিনিধিবৃন্দ সন্তুষ্টি নিয়ে কর্মস্থলে ফিরে গেলেন।

ছলনাকারীর ছলনার শেষ নেই। ষড়যন্ত্রের বিস্তৃতি আরো লাভ করলো, শুরু হয় নাটকের নূতন দৃশ্য। সম্মেলনের লিখিত সিদ্ধান্ত সমূহের কালি না শুকাতেই গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র গঠন করলো সমান্তরাল নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি, পুনরায় চক্রান্তের পথে বেয়ে এগিয়ে যায়, সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়ে। কেন্দ্রের চতুর্দিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধের বেড়াজাল সৃষ্টি করতে থাকে। গনফ্রন্টে চলতে থাকে সীমাহীন অপপ্রচার। বিশেষ সেক্টর হেফাজতে সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ গোপনে পাচার করে নিয়ে যায় অন্যত্র। বিশেষ সেক্টর কার্যালয়ে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ১ নম্বর সেক্টর থেকে মার্চ করে শতের অধিক বিভ্রান্ত অনুগামী—ক্ষমতার উচ্চাভিলাষে ও উত্তেজনায় বিশেষ সেক্টরের সাথে হাত মিলায়। জরুরী অবস্থাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকা হলো। আন্দোলনের স্বার্থে ও পার্টি ভাঙ্গন রোধ করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। চার কুচক্রী তা নাকচ করে বৈঠক এড়িয়ে যেতে থাকে। শেষ রক্ষা বুঝি আর হলোনা। দক্ষিণাঞ্চল থেকে আগত ইউনিট সদস্যদের উপর বিনাপ্ররোচনায় চার কুচক্রী বিভ্রান্ত অনুগামীরা আক্রমন করে বসে। ফলে শুরু হয়ে যায় দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল ও গুপ্তচর চক্রের মদত পুষ্ট অনাকাংখিত আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা নাইবা দিলাম। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভ্রাতৃঘাতী এই যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার তার পা-চাটা সুবিধাবাদী গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্র ও বিভেদ পন্থী চার কুচক্রী খুশীতে মহাউল্লাসে ফেটে পড়ে। দেশ প্রেমিক কর্মী ও জনগণ চার কুচক্রী ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রের তৎপরতায় ভয়াল পরিনতির অজানা আশংকায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিন অতিবাহিত করতে লাগলো। গৃহযুদ্ধ সংবাদে তারা বিস্ময়ে হতবাক এবং এ যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে শিউরে উঠলো। গৃহযুদ্ধ দ্রুত অবসানের জন্য এম, এন, লারমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কর্মী ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আন্দোলনকে অপমৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য প্রানপন লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। সীমিত ভুখণ্ড ও সীমিত শক্তি তাই বাস্তব সম্মতভাবে গৃহযুদ্ধের রণনীতি রণকৌশল নির্দ্ধারিত হলো যা গৃহযুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তির পথ প্রশস্ত করে দেয়। বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্র যুদ্ধের গতি ও ফলাফল পর্যবেক্ষণে আতংকিত হয়ে উঠে এই ভেবে যে, গৃহযুদ্ধের দ্রুত জয় পরাজয় নির্ধারিত হলে তাদের আসল উদ্দেশ্য পন্ড হবে। ইন্ধন যোগালো অকৃপণ হস্তে—হাজার হাজার কালোটাকা চার কুচক্রীর হাতের মুঠোয় দিয়ে অদৃশ্য বাঁকা চোরা গুপ্ত পথে সঞ্চালিত হয়ে আসতে থাকে; আর একটার পর আরেকটা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা

হতে থাকে তাদের গুপ্ত নিবাসে। চার কুচক্রী রোবটের ন্যায় যান্ত্রিক-ভাবে রূপায়িত করতে থাকলো সেইসব পরিকল্পনা। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বৈঠক বসে। কিন্তু চার কুচক্রী বৈঠকের আড়ালে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে অস্ত্রশক্তিতে চাঙ্গা হয়ে কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী পার্টির অনুগত বাহিনীর আক্রমণ থেকে চক্র অনুচরদের আড়াল করে রাখতে থাকে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে চার কুচক্রীদের এক "অনাক্রমণ চুক্তি" গোপনে সম্পাদিত হয়। পার্টির অনুগত বাহিনীর বিরামহীন আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে গিরি প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র ছত্রভঙ্গ হতে থাকে; প্রমাদ গুণতে থাকে এন. এস. আই আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্র। কাল বিলম্ব না করে কুমন্ত্রনা দিয়ে গিরি প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মুখে উচ্চারণ করলো শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রস্তাব। যথারীতি বৈঠক বসে, 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়ার' নীতির ভিত্তিতে সমঝোতা হয়। অনাক্রমণ চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

কিন্তু হায়, সবই ব্যর্থ প্রয়াস। বেঈমান বিশ্বাস ঘাতক, আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রের ক্রীড়নক গিরি প্রকাশ দেবেন পলাশ চক্র সমস্ত রকমের ন্যায় নীতি জলাঞ্জলী দিয়ে শান্তির আবরণে হানলো শক্তিশেল। ১০ই নভেম্বর ঘটনার মধ্য দিয়ে জাতির ললাটে কলংক লেপন করে দিলো কুলাংগার চক্র। শান্তির বপু কাষ্ঠে বলি হলেন, শতশত বছরের ভাগ্যহারা জুম্ম জাতির একমাত্র রাজনৈতিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জুম্ম জাতীয়তাবাদের জনক, আন্দোলনের নির্ভীক কাণ্ডারী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা এবং সেই সাথে আটজন সহকর্মী। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক আকাশে যেই দেদীপ্যমান নক্ষত্র চল্লিশ দশকের প্রথমার্ধে উদিত হয়েছিল, সেই দিক নির্দেশক নক্ষত্র অনন্ত মহাকাশে হারিয়ে গেল চিরতরে। যাঁর নেতৃত্বে "পাহাড়ী ছাত্র সমিতির" মধ্য দিয়ে ষাট দশকের পথচারা বুধ সমাজ পেয়েছিল নবজাগরনের শক্তির আধার; যাঁর দূরদর্শী পরিচালনার গুনে জাতীয় চেতনা ও জাগরনের প্লাবন বয়ে আনে এবং অধিকার বঞ্চিত জুম্মজনগনের মুক্তি আরাধনের সুফল "জন সংহতি সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁর রাজনৈতিক দর্শন আলোকে শতশত বছরের সামন্ত সরদারদের ডিইয়ে রাখা পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘাত ভুলে গিয়ে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে একই পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করে জুম্ম জাতীয়তাবাদের স্বার্থক রূপ লাভ করেছে, যার সুগভীর বিচক্ষন বিশ্লেষণে গৃহযুদ্ধের রহস্যময় কুয়াশার আবরন ভেদ করে দেশী বিদেশী গুপ্তচর চক্রের ষড়যন্ত্রের নীল নকসা ফাঁস হয় সেই মহাবিপ্লবী পুরুষ-রত্ন লক্ষাধিক ভাগ্য বিড়ম্বিত জুম্ম জাতির প্রিয়তম নেতার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। সেই দিন তাঁর চিতায় জ্বলে উঠা বহ্নি শিখা শোকাহত অনুগত বাহিনীর সদস্যদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অস্ত্র হাতে শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতীয় বিশ্বাস হন্তাদের উপর। চার কুচক্রীর বিভ্রান্ত অনুগামীরা ক্রমাগত মার খেয়ে শেষ পর্যন্ত পিতৃদত্ত প্রানটার তাগিদে সুরতন রাজ্যের স্বপ্ন বিলাস ত্যাগ করে সদল বলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিবির গুলোতে আশ্রয় নেয়। আর অপরদিকে গিরি প্রকাশ পলাশ তাদের সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে পার্টির নিকট আত্মসমর্পন করে।

সামরিক ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছে। শেষ অবধি বর্তমান নেতা সন্তু লারমার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও পরিচালনায় অনেকের আত্মত্যাগ, সক্রিয় উদ্যোগী কর্মীদের বিস্ময়কর আত্মপ্রত্যয় সংগ্রামী মনোভাব ও দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেমিক জনগণের অসীম সহনশীলতায় গৃহযুদ্ধের বিজয় সূচীত হয়েছে। এই বিজয় প্রমাণ করেছে—আত্মশক্তির বিকাশ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক শক্তি গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। সশস্ত্র রাজনীতিতে উপদলীয় অস্তিত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া আত্মহত্যার সামিল গৃহযুদ্ধ আবার নূতন করে এই শিক্ষা দিয়ে গেল। তাই উপদলীয় অস্তিত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। পার্টি আজ উপচক্রান্ত ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করে দিয়েছে। কিন্তু উপদলীয় চক্রান্তের বিষাক্ত পরিবেশ এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। গিরি-প্রকাশ-দেবেন পলাশ চক্রের অশরীরি অপআত্মা এখনো কর্ম পরিমণ্ডল সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

দুই বছরের গৃহযুদ্ধে সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী উৎখাত হয়েছে দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী কর্মী বাহিনীর অর্জিত হয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এক অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণিত করেছে আর ব্যাপক জুম্মজনগণ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করেছে। পার্টি আজ সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে সদা প্রস্তুত এবং সদা সতর্ক। প্রয়াত নেতার প্রদর্শিত পথে এবং বর্তমান নেতার সুযোগ্য পরিচালায় আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবেই।

জীবনের জন্যই সংগ্রাম

—শ্রীসানী

"আমি মনে করেছিলাম জুলোদা, শান্তি আর অনিল তরঙ্গের আত্মবলিদান পাভেলকে বিপ্লবে টিকে থাকার প্রেরনা যোগাবে। যেখানে অত্যাচার নিপীড়ন সেখানেই তো হওয়া উচিত প্রতিরোধ আর সংগ্রাম। অথচ পাভেল কিনা তার উল্টোটাই করলো"—কঠিন মেজাজের মানুষ নিকেল দুঃখে আর না বলে থাকতে পারলো না। আজ কদিন যাবৎ শুধু পাভেলের প্রসঙ্গ। সবার মনে রেখাপাত করেছে পাভেলের বিপ্লবী জীবন ছেড়ে রাঙ্গামাটি চলে যাওয়ার ঘটনা।

' দেখ নিকেল, বিপ্লবের সঙ্গে অন্যকিছুরই তুলনা হয় না," অনেকটা পণ্ডিত গোছের রনবীর বলতে থাকে—"কারন এটা কোন রোমান্সের ব্যাপার নয়। এটা একটা মানসিকতার ব্যাপার। হৃদয় দিয়ে যতদিন না তুমি বিপ্লবের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুভব করছো, ততদিন তোমার বিপ্লবের বিচ্যুতির ভয় থাকে। কেবল মাত্র দেশপ্রেম দিয়ে এতে টিকে থাকা যায় না। এটা একই সঙ্গে হ্যাঁ বাচক আর না বাচকও। বিপ্লব বিদ্রোহ ও নয়। তাই বিপ্লবের জন্য যেমনি প্রয়োজন মানবপ্রেম সমৃদ্ধ কোমল হৃদয়ের তেমনি প্রয়োজন অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দুর্জ্জয় সাহস ও কঠোরতা। আসলে পাভেলের দ্বিতীয় গুনটারই অভাব ছিল। "

"আচ্ছা, পাভেলদা তো অনেক লেখাপড়া করে বিপ্লবে এসেছেন। তবুও কেন বিপ্লবকে মানতে পারলো না? গত বারে কামিনী গিয়েছিল সেতো কোন লেখাপড়া জানে না। বই পড়তে না পারলে কি করে বিপ্লবে টিকে থাকার জ্ঞান পাবে?" বাবা (হুকো) টানতে টানতে প্রিয় তরঙ্গ্যা জিজ্ঞাসা করে। খুবই উৎসাহী ছেলে প্রিয়। রেইংখং রিজার্ভ এলাকার ছেলে। পার্টিতে এসে চিঠি লেখা, বইপড়া পর্যন্ত উন্নতি ঘটেছে। প্রায়ই নিকেলদের ব্যারাকে বেড়াতে আসে, কিছু একটা শিখবার আশায়। নিকেল, রনবীর, রাফেল, ইন্দুরা আট দশজন থাকে এই ব্যারাকটিতে। সবাই একই বৎসরে পার্টিতে এসেছে কলমপতি গনহত্যা আর উপদ্রুত এলাকা বিলের প্রতিবাদে। সবাই কলেজের ছাত্র। পাভেল ও থাকতো এখানে। একসপ্তাহ আগে কেরাপ পাত্যা জোনে গিয়েছিল মা-বাবার সাথে দেখা করতে। তারপর আর ফিরে আসেনি।

ইন্দু বই পড়ছিল। প্রিয় তরঙ্গ্যার কথাতে বইটি বন্ধ করে বললো—"স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে পড়লে যে জ্ঞানী গুনী হওয়া যায় তোমাকে কে বলেছে? মানুষের যদি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, দেশপ্রেম না থাকে, ত্যাগী না হয়, সমাজ বিশ্লেষনের ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে কখনো জ্ঞানী গুনী হতে পারে না। তুমিতো জান আমাদের জাতীয় শত্রুরা অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত অথচ দেখ এরা সরকারের পক্ষে দালালী করা ছাড়া আর কিই বা জানে। ইন্দু খুবই ধীর প্রকৃতির। খাওয়া দাওয়া, চলা, ফেরা সবকিছুতেই ধীর স্থির। আশু তোতলামির জন্য একটু কম কথা বলে। ইন্দুর কথা শেষ হতে না হতেই উত্তেজিত স্বরে নিকেল আবার বলে উঠলো—"আমি রাজনীতির অত সাত পাঁচ বুঝি না। আমার কথা হচ্ছে আমাদের জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। পার্টি যদি টিকতে না পারে তাহলে আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি সবই ভেঙ্গে যাবে। তাছাড়া পাভেল গত এক বছরে খেগা, ভগা, সুবলং হরিনা ইত্যাদি এলাকার বাস্তব চিত্র দেখেছে। বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে কিভাবে মানুষ দিন কাটাচ্ছে, সরকারী বাহিনী জুম্ম জনগনের উপর কতো অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করে চলেছে এ সবই তো সে চোখে দেখেছে। শুধুমাত্র খেগা এলাকার জনগনের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখেই তার টিকে থাকার কথা। "

"তোমার কথাগুলি বড় হচ্ছে। অফিসে ডিস্টার্ব হবে একটু ছোট করো। এসব বাজে কথা বলে লাভ নেই,"—সতর্ক করে দিয়ে বললো রোমেল নিকেলকে। একটু লজ্জা বোধ করলো নিকেল। বলতে বলতে কখন যে গলার স্বর বড় হয়ে যায় মনেই থাকেনা তার।

"এসব কথা তুমি বাজে বলছ। এখানেতো পথ দেখাবার উপায় নেই আমাদের। একসঙ্গে চারজনে পার্টিতে এসেছি। আমাদের কি মনে করবে অন্যান্যরা ভেবে দেখেছ?" সোহেল উত্তর দিলো রোমেলকে।

সোহেলের কথাতে রোমেল একটু আবেগ প্রবন হয়ে বলতে থাকে— "দেখ, পাভেল আর আমি ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। একই সাথে স্কুলে গেছি। তারপর কলেজের পড়া সাঙ্গ করে শেষে পার্টিতে দুজনে একসাথে যোগ দিলাম। অথচ আমাকে পর্যন্ত বলে গেল না। ফাঁকি দিয়েই গেল। এসব লোকের কথা কি

যাচ্ছে কথা নয়? আর আমাদেরই বা কি হবে? আমরা কি তাকে ধরে রাখতে পারি ?''

এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিলেন রাসেল। রাসেল খুবই অনুসন্ধিৎসু আর বই পড়েন খুব বেশী। আই. এস. সি কেন্ডিডেট হয়েও পরীক্ষা না দিয়ে পার্টিতে চলে আসেন। হাতের বইটা রেখে রাসেল বললেন—''পাভেল গেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না। এখন কথা হচ্ছে তার যাওয়াটা কিভাবে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। আর এই যাওয়া থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি? গত দেড় বছরে পাভেল এমন অনেক ঘটনা ও অবস্থার মুখোমুখী হয়েছে যা একজন মানুষের পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট। রাঙ্গামাটিতে তোমরা ছিলে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। জুম্মদের ছাত্র ৫০% জন শহরে বন্দরে রয়েছে। বাকী ৯০% জনের অবস্থা জানতে হলে দেশের দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে আসতে হয়। জুম্মদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে উগ্র ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার যে কি জঘন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তা রাঙ্গামাটি বা অন্য কোন শহর বন্দরে থেকেই বুঝা যাবে না। মানবতার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে ধর্মের উন্মাদনায় মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, গঙ্গারাম সুবলং এলাকায় আর্মীরা যা করেছে তা না দেখলে বুঝা যায় না। দুটো গ্রামকে পুড়িয়ে শ্মশান বানিয়েছে আর্মীরা। গ্রামবাসীরা প্রায় সবাই পালিয়েছিল। দূরে পালাতে পারে নি এক গর্ভবতী মহিলা ও এক অসুস্থা যুবতী মেয়ে। বাড়ীর পাশের জঙ্গল থেকে গর্ভবতী মহিলাকে বের করে ধরে এনে বেয়নেট দিয়ে পেটের বাচ্চাটি সহ হত্যা করেছে। আর অসুস্থা যুবতী মেয়েটি অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত একজনের পর আরেকজন ধর্ষণ করেছে। এখানেই আর্মীরা ক্ষান্ত দেয়নি, তারা সুবলং পানছড়ির ভিতরে এক মোন ঘরে এক আশি বছরের বৃদ্ধকে দোর (দরজা) বেঁধে পুড়িয়ে ফেলে। কি জঘন্য! অথচ রাঙ্গামাটির লোকেরা এসব কিছুই শুনতে পায় না। পাভেল এসবই দেখেছে। শুধু তাই নয়, খেগা, ভগা ইত্যাদি এলাকায় জুম্মরা জঙ্গলের আলু খেয়ে কত কষ্টে বছরের পর বছর বেঁচে রয়েছে এসবই পাভেল জানে।'' একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রাসেল আবার বলতে থাকেন। ''দেখ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে এসে আমরা জানতে পেরেছি জুম্ম জাতির শৌর্য বীর্যের কথা, প্রত্যক্ষ করছি আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির মহিমা। গত এক যুগের মধ্যে সংঘটিত অনেক খণ্ড যুদ্ধে আমাদের ভাইয়েরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তা একমাত্র বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীরাই জানা আছে। অথচ এসব দেখেও পাভেল আশ্বস্ত ও আত্মবিশ্বাসী হতে পারে নি। আমরা যতই ক্ষুদ্র জাতি হইনা কেন, যতই অনগ্রসর ও অশিক্ষিত হইনা কেন আজ জুম্ম জনগণ জন সংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রামী মুখর। সুতরাং একদিন না একদিন আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। কারণ ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে সকল দানবীয় শক্তি পরাজিত হতে বাধ্য। আমার মতে একজন বিপ্লবী হিসেবে এই সমস্ত বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।''

রাসেলের কথা শেষ হতেই ঘড়ি দেখে সোহেল বলে উঠলো—''কথা বললে আর হবে না ভাইয়েরা'' দুটো বেজে গেছে সবাই কাজে চলে গেছে। চল্ চল।''

বিকেল চারটের সময় নিকেল আর সোহেল ফিরলো জ্বালানী কাঠ আনার ডিউটি শেষ করে। স্নানের পর ফল-ইন। তারপর বিকেলের খাওয়া শেষে ব্যারাকের সামনে আবার সবাই এসে বসলো। পাভেলের কথাই এসে গেলো প্রথমে। প্রসঙ্গ ক্রমেই এসে যায় তাদের সেই ফেলে আসা স্কুল জীবনের কথা তাদের মধ্যে প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনা, কলেজ জীবনের রোমান্সের কথা। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি পড়ুয়া বন্ধুদের কথা। স্বপ্না, বিজয়া, সুবর্ণা, তাতুদের সংবাদ না পাবার কথা। তারপর আসে বিপ্লবী জীবনের কথা সেই প্রথম কেবাপ পাত্যা জোনে যোগদানের স্মৃতি। রাঙ্গামাটি থেকে বাপ, মা, ভাই-বোনদের ফাঁকি দিয়ে আসার কথা। সেদিন ছিল শুক্রবার ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং সাল। সকালে কলেজে যাওয়ার নাম করে পালিয়ে আসার কথা। তাদের মনে প্রাণে একটিই প্রতিজ্ঞা—জীবন দিয়েও জুম্ম জাতির মুক্তি সাধন করা—উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদকে উচ্ছেদ করা। হয়তো তারা কেউই বাঁচবে না—তবুও তাদের একটি প্রত্যাশা—মহৎ মৃত্যু।

নিকেল। বড় বিদঘুটে মানুষ নিকেল। ইস্পাতের মত কঠিন তার হৃদয়; আবার এই কঠিন হৃদয়ে আছে কতনা মায়া মমতা। শৈশব, বাল্য, কৈশোর তার কেটেছে কতনা ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে খেলা করে। অভাব আর দারিদ্র্যের সাথে চিরকাল সখ্যতা। পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরবঞ্চিত, অবহেলিত সকল জুম্ম জনগণের প্রতিচ্ছবি নিকেল। যে বৎসর তার জন্ম হয়, সেই বৎসরই কাপ্তাই বাঁধের কারণে তার পিতাকে পাড়ি জমাতে হয় চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটা ছেড়ে ফেনী ভেলীতে। ১৯৭১ সালে মুক্তি বাহিনীর অত্যাচারে আবার উদ্বাস্তু হয়ে আসতে হয় পানছড়িতে। পানছড়িতে মুক্তি বাহিনীর হামলাকালে আবার তাঁদের সবাইকে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বাঁচতে হয়। অবশ্য তাদের গ্রামের বেশ কজনকে দাও দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে মুক্তি বাহিনীরা। পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তাদের গ্রাম, ছোট বেলা থেকেই পড়াশুনায় বরাবরই ভাল ছিল নিকেল। ১৯৭৭ সালে রাঙ্গামাটি চলে যায়। আশা মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করবে। ১৯৮০-তে মেট্রিক পাশ করলো দ্বিতীয় বিভাগে। পাভেল, রোমেল

আর সোহেলের সাথে রাঙ্গামাটিতেই তার পরিচয় হয়।

পার্টিতে এসে নিকেলের মানসিকতার বিরাট পরিবর্তন আসে। স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনার মধ্য দিয়ে পার্টির নীতি আদর্শের সাথে কখন যে তার মন প্রাণ মিশে গেছে সে নিজেই টের পায়নি। পার্টি ছাড়া জীবনকে সে এখন কল্পনাও করতে পারেনা। পাভেলের ঘটনা তাকে খুবই আঘাত দেয়। সে ভাবতেই পারেনা। সারাজীবন পাভেল কি করে কাটাবে একটা পরাজিত জীবন নিয়ে। তার মতে মানুষতো খাদ্য সর্বস্ব জীবন নয়। রাঙ্গামাটিতে বিলাস বহুল আরাম অথচ আত্মবিক্রীত জীবনের চেয়ে আজীবন রক্ত পিচ্ছিল সংগ্রামী জীবনই অনেক শ্রেয়। পাভেলের এই পলায়নী মনোবৃত্তি নিকেলকে আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে। পার্টির কোন প্রকার সমালোচনা আর সহ্য হয়না তার। গোটা পার্টিটা যেন তার নিজের। যে সমস্ত তরুণ পার্টিতে না এসে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে, উচ্চশিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় বাংলাদেশ সরকারের দালালী করছে, তাদেরকে মানুষের স্বীকৃতি দিতেও নিকেল এখন নারাজ। তার মতে যে সময় গোটা জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে সেই সময়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালাভের আশায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা চক্রান্তেরই সামিল। কারণ কি করতে হবে সেটাতো এখন সবার জানা। আমাদের পার্টি আছে, আছে সুযোগ্য নেতা ও নেতৃত্ব। সর্বোপরি রয়েছে সংগ্রামী জুম্ম জনতা। তোষামোদী বা দালালীতে জীবন হতে পারেনা, যা হয় তা হলো পা চাটা লেজুরের জীবন।

'৮২ সালটা নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। ইতি মধ্যে মার্কোস এবং বেশ ক'জন বিপ্লবী জীবনের ইতি টেনেছেন। নূতন কর্মীর ব্যাপক হারে আগমন ঘটেছে। ক্রমে একটা জিনিষ পরিস্কার হচ্ছিল। গৃহযুদ্ধের পূর্বাভাস। পার্টি নেতার প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপনের কথা শোনা যাচ্ছিল কতিপয় উচ্চ মহলের কাছ থেকে। একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। জানুয়ারীতে নিকেলকে কালেকশান ডিউটিতে নিয়োগ করা হয়।

ইন্দু ও দীপায়ন আগেই বনা সেক্টরে চলে গেছে। দিন যতই যাচ্ছে ততই একটা অশুভ ইঙ্গিত নিকেলের মনকে দোলা দিতে থাকে। হৈংথং এলাকায় এক প্রকার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে হয় নিকেলকে। রাসেল, সোহেলরা মাঝে মাঝে লিখে। অবশেষে এল ১৪ই জুন। গৃহযুদ্ধে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। শতবৎসরের পরাধীন জীবনের অবসান ঘটানোর দৃপ্ত শপথে একদিন যে জুম্ম যুবকেরা মা বাবা ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা ছেড়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, যারা একদিন স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির সম্ভাবনাময় জীবন ফেলে এসে জঙ্গলের অস্বাভাবিক জীবনকে পাথেয় করে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছিল, আজ তারাই দু'ভাগে ভাগ হয়ে লড়াই করছে পরস্পরকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে। হায়রে রাজনীতি এত নিষ্ঠুর ও নির্মম! উত্তরাঞ্চল থেকে বন্ধুরা লিখলো, আমরা জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিপথ-গামী ভাইদের প্রতি গুলি চালাতে বাধ্য হচ্ছি। এছাড়া কোন উপায় ছিলনা। গোটা জুম্ম জাতি এক শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থায় উপনীত হলো।

কাজে মন বসে না নিকেলের। এমনিতে ছোট বেলা থেকে চঞ্চলমতি। গৃহযুদ্ধের বিষক্রিয়া গোটা পার্বত্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। চক্ররা রনাঙ্গণে মার খেলেও রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডায় লেটেষ্ট টেকনোলোজিতে সমৃদ্ধ একটা পর একটা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে চক্রান্ত কারীরা বিভ্রান্ত করতে চাইছে। যতই দিন যাচ্ছে ক্রমশ গৃহযুদ্ধ জটিলতর হয়ে উঠছে। এসব কিছুই লক্ষ্য করছে নিকেল। রনাঙ্গন থেকে অনেক বন্ধু লিখে জানায়, সমস্ত কর্মীমহলে আন্দোলনের অনিশ্চয়তা নিয়ে চিন্তা দেখা দিয়েছে। আস্তে আস্তে নিকেলকে গ্রাস করছে দুশ্চিন্তা নামক বস্তুটি। এখন পড়তেও মন বসে না। সব সময় অন্তরটা ঘুরে বেড়ায় বিশেষ সেক্টরে কি হচ্ছে জানার জন্য। নিক্রন, ক্যাননরাও একই অবস্থা জানায় সেক্টর থেকে। কর্মীরা আগের মত আর খোলামেলা নয়। কর্তৃপক্ষ সব সময় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দেয়। গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু তবুও কিসের একটা কালোছায়া পড়েছে কর্মীদের চোখে মুখে। তার পর এলো লোভনীয় টোপ—এর শাদের সাধারন ক্ষমার ঘোষনা। প্রথমে কেউই তেমন পাত্তা দেয়নি। ভেবেছিল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কর্মীদের প্রভাবিত করতে পারবে না টাকা পয়সা। অবশেষে ব্যতিক্রম হতে দেখা গেল। কয়েকজন সত্যি সত্যিই সাধারন ক্ষমার সুযোগ গ্রহন করলো। বুঝতে পারে নিকেল : তার মত একই ভাবে বিভিন্ন স্তরের কর্মীকে ও প্রভাবিত করেছে গৃহযুদ্ধ। জনগন উভয় পক্ষকে চাপ দিচ্ছে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে। গোটা পার্বত্য দেশে সংগঠন বিকল হয়ে যাবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। এসব কিছুই ভাবিয়ে তুলেছে সংগ্রামী সচেতন নিকেলকে। অনুভব করতে পারে নিকেল আগের মত আর কিছুতেই শক্ত হতে পারে না। চারটি মাস পার হতে চললো। গৃহযুদ্ধ অচিরেই শেষ হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। রনাঙ্গন থেকে সবাই লিখছে গৃহযুদ্ধ অচিরেই ধ্বংস হবে। কিন্তু তবু যেন আশ্বস্থ হতে পারে না নিকেল। অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দেয় সন্দেহ ভাজন মনে। পরিস্থিতি যদি সত্যিই আমাদের অনুকূলে থাকে তাহলে সোরবেক ছাড়ি, মানিক্য ছড়ি ঘটনা কি করে ঘটলো? এক নম্বর সেক্টরে কেন আমাদের সমর্থন নেই? জাতীয় দুলারা (প্রতিক্রিয়াশীল দালাল) কেন এত তৎপর ইত্যাদি। এসব কিছু

ভাবতে ভাবতে বিষন্ন হয়ে পড়ে নিকেল। কাজে মোটেও মন টেকে না। আবার প্রশ্ন জাগে তাহলে কি চক্রদের সত্যিই কিছু ভিত্তি আছে? আমাদের পুরোনো নেতৃত্ব কি সত্যিই রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে? কিছুতেই মানতে পারে না নিকেল। যে লারমা ছাত্র জীবন থেকে প্রগতিশীল রাজনীতির মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছেন তিনি কি করে রক্ষনশীল হতে পারেন? যে লারমা জুম্ম জাতির স্বার্থকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবতে পারেন না তিনি কি করে স্বার্থের রাজনীতি করবেন? যে লারমা সর্বপ্রথম দশভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির অধিকারের কথা তোলেন দেশে বিদেশে তিনি কি করে জুম্ম জাতির অমঙ্গল কামনা করতে পারেন? যে লারমা মন্ত্রীত্বের লোভ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন, যে লারমা শেখমুজিব সরকারের মৃত্যুর হুমকিতে ভীত হননি, তিনি কি করে কাগুজে বাঘের ভয়ে ভীত হবেন? এসব কিছু ভেবে ভেবে আবার আশা ফিরে পায়। বিষন্ন মুখে মুক্তার হাসি ঝরে। হতাশার সাগরে ভেসে উঠে আশার সপ্ত ডিঙ্গা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় নিকেল। অত্যাচারিত নীপিড়িত জুম্ম জাতির প্রতিকৃতি দেখতে পায় নিজের মুখে, মানসপটে ভেসে উঠে হাসি খুশী মুক্ত জুম্ম জাতির।

হাঁ। ষড়যন্ত্র তো তারাই করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সেই নেতারাইতো তাদের দলে গেছে যারা দূর্নীতি বাজ, ষড়যন্ত্রকারী আর ক্ষমতা লোভী। যারা পার্টির অগ্রগতি এতদিন নানা ভাবে রুদ্ধ করে রেখেছে। আর গিরি প্রকাশ—দেবেন—পলাশ চক্রকে তারাই সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে যারা নিজেকে উচ্চশ্রেণীর মনেকরে মাতৃভাষা ভুলে যায়, যারা জুম্ম জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ খুঁজে পায় না, যারা সরকারের পক্ষে দালালি, তোষামোদি ও আন্দোলনের বিরোধীতা করাটা তথাকথিত দেশ প্রেম ও আনুগত্যের পরিচায়ক বলে মনে করে। তাইতো ছাত্র সমাজের একাংশ, জাতীয় দুলারা, (প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী দালালরা) প্রভুভক্ত চাকুরী জীবিরা, বুদ্ধি জীবিদের একাংশ আজ গিরি প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। নিকেল আরো গভীরে গিয়ে ভাবতে থাকে—ভাবতে ভাবতে কখন যে আনমনা হয়ে যায় নিকেল টের পায় না। পরক্ষণে মনে পড়ে আবেগপ্রবন হচ্ছেনা তো? না, আবেগের প্রশ্নই উঠে না। বাস্তবেই তো গৃহযুদ্ধ চলছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় নিকেল। চক্রদের অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। এর মধ্যে পৌঁছে গেলে এক মহাখুশীর সংবাদ। আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি হবে। সবার চোখে মুখে খুশীর ভাব—আমরা আবার এক সঙ্গে লড়বো। সবার একটি কথা আমাদের নিক্ষিপ্ত লেট আর শূন্য করে দেবে না কোন জুম্ম মায়ের কোল।

আসলে আত্মহারা হয়ে যায় নিকেল। হতাশার কালোমেঘ সরে যায় আশার আলোর বন্যায়। আবার স্বপ্ন এসে জড়ো হয় তার হৃদয় আঙিনায়। অবচেতন মনে কখন যে ভেঙ্গে যায় খেয়াল থাকে না তার সেই প্রিয় গান "আমি এক যাযাবর"! মনে পড়ে ৮১ এর হাসি খুসিতে ভরা দিনগুলো। নুতন কর্মীর প্রচণ্ড ভীড়। কাজের কোন শেষ নেই। তবুও আনন্দ হিল্লোল। একত্রে বসলে নানা আলাপের মাঝে কেউ বলতো—আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ফিরে এলে আমি সাংবাদিক হবো, কেউবা বলতো আমি বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে আমাদের ইতিহাস উদ্ধার করবো। এখনো মনে পড়ে পাভেল বলতো আমি অবশ্যই একজন বড় দেশ সেবক হবো তারপর নিকেল বলতো আমি কি আর কম? আমি একটা আন্তর্জাতিক মানের সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবো যার মধ্যে স্থান পাবে নির্য্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী, অভিজাত শ্রেণীর বিলাসিতা ও বর্বরতার কাহিনী নয়। কেউবা বলতো; আমি একজন শিল্পপতি হবো, শিল্প ছাড়া কোন দেশ উন্নতি করতে পারে না। রোমান্স আর নাটকীয়তায় ভরা উজ্জল তারুণ্যের কত আশা ভরসা। তারপর কথা প্রসঙ্গ বদলে যেতো রণবীরদার শাসানিতে—"তোমরা এসব থেকে কবে মুক্ত হবে? বিপ্লবী জীবনে রোমান্সের কোন স্থান নেই।" প্রতিবাদ করতো নিকেল—"উচ্চাশা ছাড়া কি মানুষ বড় হতে পারে? তারপর চলে যেত অন্য প্রসঙ্গে বিপ্লবের কঠিন কাঠিন্যতার কথা, এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের কথা। আবার রাঙ্গামাটির কথা মনে পড়ে। ছয় বছরেও স্মৃতি ভুলা যায় নি। পপি, সুপ্রিয়া, শ্যামলীদের কথা। দু'জনে কতোই না কাছাকাছি ছিলো। বিপ্লবে না আসলে হয়তো এতদিন দুজনে··· — —। স্কুল জীবনের সাথী তাতু, তন্দ্রাদের কথা; বটগাছ তলায় রতন, দীপক আর বিজয়া, সুবর্ণাদের সাথে গল্প শেষ করে সন্ধ্যার সময়ে ৭।৮টার দিকে বাসায় ফেরা—এসব কিছু মনে পড়ল সত্যিই মনটা ভারী হয়ে আসে নিকেলের। আসার একদিন আগে নিকেল পপিকে বলে এসে ছিল "কাল বাড়ী যাবো"। বিজয়াকে লিখে এসেছিল—"ওরা আমাদের ১০%. জনকে সম্মান করলেও ৯০%. জনকে মানুষ ভাবে না। ওরা আমাদের বাপ ভাইকে বিনা দোষে মারবে। জেলে দেবে, মা বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আর আমি নিজের জন্য উচ্চশিক্ষা নেবো।" আমি জীবনের বিনিময়ে হলেও এর প্রতিশোধ নেবো।" তারপর তারপর মনে পড়ে যায় সোহেলের কথা। খাতা কলম নিয়ে চিঠি একটা লিখছে "গৃহযুদ্ধ শেষ হতে যাচ্ছে। আগামী জানুয়ারীতে ছুটি পাবো। নিরুন ক্যানন সহ যাবো। তোমার মাকে খবর দেবো। আমাদের সেখানেই একত্রে কাটানো যাবে সময়টা।"

আজ দু'টো মাস পরে নিকেলের জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাতটা

এলো সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়—বিনা মেঘে বজ্র পাতের মত। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে না পারলেও শেষপর্যন্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্ভব হলো না অন্য সবাইয়ের মত নিকেলের ও; বিশেষ করে জুম্ম জাতির আন্দোলনের অগ্রদূত, অদ্বিতীয় জাতীয় নেতা, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা যে নিহত হতে পারেন এটা কল্পনারও বাইরে ছিল নিকেলের। অনেক চেষ্টা করেও আর স্বাভাবিক থাকতে পারলো না নিকেল। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে ভুলে যাবার চেষ্টা করলো বাস্তবতাকে। তবুও নানা প্রশ্ন এসে জমা হয় মানসপটে। জীবনের অনেক বজ্রকঠিন আঘাতের সাথে এর কোন মিল নেই। হতাশায় কল্পনা করে—আহা, যদি তার এমন শক্তি থাকতো তাহলে এই মুহূর্তে নেতার হত্যা-কারীদের ধ্বংস করে দিতো। দরকার নেই এই দুষ্ট কীটগুলো বেঁচে থাকার। আবার কল্পনা করে এই জীবনে কেন জন্ম নিলাম এমন ক্ষুদ্র আত্ম বিস্মৃত জাতির মধ্যে! যে লারমা জুম্ম জাতির জাগরণ এনে দিয়েছে তাঁকে প্রাণ দিতে হলো নিজেরই শিষ্যের হাতে। হঠাৎ মনে পড়ে তার একটা কথা—আত্ম সমর্পণ করলে কি হয়? গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই আজ তার প্রথম মনে পড়লো এই কথা। হয়ত চরম হতাশা থেকে। অনেকেই তো আজ সারেণ্ডার করেছে। মুহূর্তেই গায়ে শিহরণ জাগে তার। বুকের ভেতর থেকে একটা গরমভাব বেরিয়ে আসে। কার কাছে আত্ম সমর্পণ? কিসের জন্য? কি অন্যায় করছি আমরা অধিকারের দাবী জানিয়ে? না সেটা কি করে সম্ভব? গোলামী করার চেয়ে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়া শ্রেয় তার কাছে। অন্যদের কথা আলাদা। মুহূর্তে মনে পড়ে খেগা, ভগা, ইত্যাদি দুর্গম এলাকার সভ্যতার আলো বঞ্চিত অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের প্রতিচ্ছবি। কি হবে অর্ধ উলঙ্গ মুরুং, চাকদের ভবিষ্যৎ। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার বঞ্চিত আশাভরসা শান্তি বাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি আজ চরম চ্যালেঞ্জের মুখো-মুখী। কি হবে যদি চক্রুরা জয় করে। চক্রুদের প্রধান কর্তা তারা নীতি আদর্শের চেয়ে স্বীয় স্বার্থটাই প্রাধান্য দেয়। আদর্শহীন জাতি, সে কেমন? বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। সমাজের কৃষক, শ্রমিক মধ্যবিত্ত পরিবারের দামাল ছেলেরা দুমুঠো অন্নের আশায় একটা কুড়ে ঘরের আশায় যুদ্ধ করে হাজারে হাজারে জীবন উৎসর্গ করলো বিনিময়ে তারা কি পেল? স্বাধীনতার ফসল নিয়ে নিয়েছে সুবিধাবাদী শ্রেণী। সুবিধাবাদী আর পরজীবিদের রসদ জোগাতে আজ জেলের জাল নেই, মাঝির নৌকা নেই, কৃষকদের বীজ নেই, চিকিৎসার অভাবে মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের বীর প্রতীক পি, জি হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। বুকের ভিতরটা ধরপড় করে নিকেলের। না এ-হতে পারে না। যে করেই হোক, ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতেই হবে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় আবার নিকেল।

পরবর্তী জুন মাসে বিশেষ সেক্টরে পৌঁছলো নিকেল ও তার সহ যোদ্ধারা। তাদের আগে ও দুটো গ্রুপ এসেছে। তারা সর্বশেষ গ্রুপ গৃহযুদ্ধ চিরতরে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে এসেছে। অনেক দিনের পর সে আবার বিশেষ সেক্টরে আসলো। আশা বাড়ীর খবরও নেবে নিকেল। নিজের ইচ্ছায় যোগ দিতে এসেছে নিকেল রণাঙ্গনে কালেকশান ডিউটি বাদ দিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে কালেকশানে রাখা যায়নি। তার কথা চক্রুদের সাথে সে মোকাবেলা করবেই। এরি মধ্যে বন্ধুদের মধ্যে রোমেল ও অম্লান বিপ্লবী জীবন ছেড়ে তথাকথিত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে। এ সব কিছুই তাকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু সে আলাদা জগতের মানুষ। উত্তরাঞ্চলে এসে জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এই ক'মাসে অনেকগুলো খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো নিকেলরা। চক্রুরা ইতি মধ্যেই কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। তবুও দেশী বিদেশী গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। তাই গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। কখনো উপোষ থেকে, কখনো নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েও নিকেলদের সবার মুখে হাসি আর আনন্দ। আত্ম বিস্মৃত জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখে ভবিষ্যতের ছবি আঁকে নিকেল। অক্টোবরে নিকেলরা বাংলাদেশ আর্মীর একটা গ্রুপের সাথে মুখোমুখি হয়ে অনাকাঙ্খিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের দু'জন শত্রুর হাতে নিহত হলো। আর্মীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর কিছুদিন পর নিকেলের কাছে খবর পৌঁছলো বাড়ী থেকে বৃদ্ধ মা খবর পাঠিয়েছেন দেখা করে আসতে। অনেকটা ঝিমিয়ে পড়লো নিকেল। হিসেব করে দেখলো আজ চার বছর হলো পরিবারের সবাই এর সাথে দেখা নেই। মা বাবার সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। গৃহযুদ্ধ না হলে অবশ্য গত বছর ছুটিতে আসার কথা ছিল। তার কঠিন হৃদয় হঠাৎ মায়ের জন্য আকুল হয়ে উঠলো। মনে পড়লো স্কুলে পড়ার সময়েও তার মা তাকে ছাড়া একদম থাকতে পারতো না। ইউনিট কম্যাণ্ডারের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলো সপ্তাহ পর গ্রামে গিয়ে মা বাবার সাথে দেখা করে আসবে। দুদিন পর খবর এলো চক্রান্তকারীদের একটা ইউনিট তাদের অবস্থান থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থান করছে। গতকাল থেকে নিকেলের শরীর ভালো যাচ্ছে না। এমনিতেই আকাশেআকাশে মেঘ। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছে কদিন আগে থেকে। রাতে ঘুম হয়নি নিকেলের ঠাণ্ডার জন্য। সকালে আরো খারাপ লাগলো। দুপুরে সামান্য ভাত খেতে পারলো নিকেল। বিকেল ৪টার আগে রাতের খাওয়ার খেয়ে রওনা দিলো নিকেলরা চক্রান্তকারীদের অবস্থানের উদ্দেশ্যে। দুটো গ্রুপে ভাগ হলো তারা। নিকেলরা আগে যাবে ২৫ জন। শরীরের খারাপ অবস্থার জন্য সবাই

বারণ করলো নিকেলকে। কিন্তু নিকেল নাছোড়বান্দা। স্কাউট দুজনের পর নিকেল। সন্ধ্যার একটু আগে নিকেলদের গ্রুপটা শত্রুদের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো। শত্রুদেরকে পিছন থেকে আক্রমন চালাবে নিকেলরা ঘুরে গিয়ে। সামনে একটা গ্রাম। গ্রামের পর মাঠ। মাঠের পর আবার সামান্য উঁচু জায়গায় বিস্তীর্ণ জঙ্গল। জঙ্গলের একটা কোনায় অবস্থান করছে বিপথগামীরা। গ্রামটা পাশ কেটে মাঠটা পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় উঠলো নিকেলরা। সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে চললো নিকেলরা। উঁচু নীচু পথ বেয়ে পাহাড়ের প্রথম চূড়া স্থান অতিক্রম করে নিকেল নামতে আরম্ভ করেছে। তার সামনের দুজন দুই পাহাড়ের মাঝখানের নীচু জায়গাতে পৌঁছে গেছে। সামনের বড় চূড়াটির উপর থেকে আচমকা ভেসে এলো—হল্ট, হ্যাণ্ডস্ আপ—তোমরা কারা? চক্রান্তকারীরা আগেই সেখানে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল গন্তব্য পথে। তার পর স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের শব্দে আর কিছুই শোনা যায়নি। ১৫ মিনিট গুলি বিনিময়ের পর বিভেদপন্থীরা সরে যেতে বাধ্য হলো; চূড়োটা আমাদের দখলে আসলো। ইউনিট কম্যাণ্ডার সবাইকে একত্র হতে বললো। সবাই অক্ষত আছে কিনা তদব করতে করতে দেখা গেল নিকেল নেই। তখন চারি পাশ খুঁজে নিকেলকে পাওয়া গেল। তবে জীবিত নয়, তার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে মাটিতে—এল্. এম. জি. টা দু'হাতে ধরে। একটা বুলেট বাম চোখ হয়ে পিছনে বেরিয়ে গেছে। আর একটা পেটের সামান্য উপরে লেগে পিঠের দিকে বেরিয়ে গেছে। ফায়ার করতে পারেনি নিকেল কারন শত্রুর প্রথম ব্র্যাশে গুলি বিদ্ধ হয়। পশ্চিমাকাশে তখন সন্ধ্যা তারাটি জ্বলজ্বল করছিল। দূরের গ্রামগুলিতে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। নিকেলের নিষ্প্রাণ দেহটা সঙ্গে করে তখন আবার এগিয়ে চলার নির্দ্দেশ দিলো ইউনিট কম্যাণ্ডার।

আজ গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছে। প্রায় দু'বছরের শ্বাস-রুদ্ধকর অবস্থা দূরীভূত হয়েছে সত্য কিন্তু শতাব্দী ব্যাপী নির্য্যাতন নিপীড়নে জর্জরিত জুম্মজাতি তথা সর্বহারা জাতি ও মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু নিকেলের মতো অনেক অমূল্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নিকেল ও অন্যান্যদের আত্মত্যাগ, সাহস ও বিপ্লবী চেতনা সংগ্রামের জীবন নয়, জীবনের জন্যই সংগ্রাম— এই শিক্ষাই দিয়ে গেল।

সেই ভদ্রলোকটি

—শ্রী অংজয়

আমি একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। আমার নিবাস ও কর্মস্থল পার্বত্য চট্টগ্রামের সুদূর দক্ষিণের এক দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে। নানান কাজে সদর দপ্তর রাঙ্গামাটি শহরে বছরে কয়েকবার আমার আসতে হতো কোন এক বিশেষ দরকারে ১৯৭০ সালে আমি রাঙ্গামাটি শহরে আসি। শহরে আসলে অনেক সময় বৌদ্ধ বিহারে থাকতাম এবারেও বৌদ্ধ বিহারে উঠলাম। একদিন বিহারে এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়। ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী ও গৌরবর্ণের ছিলেন। প্রথম আলাপেই ভদ্রলোকের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। আলাপ আলোচনায় জানতে পারলাম তিনি বিহারের অনতি দূরে এক বাড়ীতে থাকতেন। ভদ্রলোক বৌদ্ধ বিহারে বাতি জ্বালিয়ে চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার পর বিহারে আগত জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম —ভদ্রলোকটি' কে? ভদ্রলোকের পরিচয় জেনে খুবই খুশী হলাম। কারণ তাঁর সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেও শুনেছি তবে পরিচয় ছিলো না। ভদ্রলোকটি আর কেউ নন, ইনি হলেন জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের পথিকৃৎ মহান মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা।

পরের দিন প্রয়াত: নেতার সাথে আবার দেখা হয়। আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে অনেক কথাবার্তা হ'ল। যাবার বেলায় বলে গেলেন —''আসুন না আমার এখানে একবার; অনেক কথাবার্তা বলা যাবে।'' তাঁর আমন্ত্রন আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। একদিন গেলাম তাঁর বাসায়। আমায় সাদরে বরণ করে বসালেন। প্রয়াত: নেতা খুবই সরলভাবে জীবন যাপন করতেন। একটা সাধারণ ঘরেই তাঁর বসবাস ছিল। একজন জাতীয় নেতা এত অনাড়ম্বর জীবন যাপন যে করেন তা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। যাহোক সেদিন জুম্মজাতির দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে অনেক কথায় বললেন। জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জুম্মভূমির অস্তিত্ব কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে তাও আমায় বুঝিয়ে বলেন। তাছাড়া, জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে শিক্ষক সমাজের কি ভূমিকা দেয়া দরকার তাও প্রয়াত: নেতা কথা প্রসঙ্গে উত্থাপন করলেন। —এভাবে আমি সেই ভদ্রলোকের দেশপ্রেম, সাহস ও ব্যাক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারিনি। ফলশ্রুতিতে আমিও ধাপে ধাপে জুম্ম জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে জড়িত হয়ে পড়লাম।

তারপর থেকেই এম,এন, লার্মার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে আমারই মাধ্যমে তিনি আমাদের অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জুম্ম জনগনের কাছে সরকারের শাসন শোষনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রামী হওয়ার মন্ত্র পৌছে' দিতে সচেষ্ট থাকেন। রাঙ্গামাটি আসলেই প্রয়াত নেতার সাথে যোগাযোগ না করেই আমি ফিরে যেতাম না। প্রতিবারেই তিনি নূতন নূতন কথা শোনাতেন এবং জুম্ম জনগনকে অধিকার সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। সর্বোপরি চিঠি পত্রের মাধ্যমেও অনেক উপদেশ পরামর্শ দিতে থাকে। কোন এক সময়ে তাঁর সাথে আমার একবার বান্দরবন সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেছিলেন মাষ্টারবাবু যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে দশভিন্ন ভাষা ভাষি জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্বের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। জাতীয় অস্তিত্বের কথা বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছুই ভাবা যায় না; তাই তিনি সাধারণ জুম্ম জনগণের মঙ্গলার্থে আমায় অনেকদিক দিয়ে সাহায্য করতে বরাবরই এগিয়ে আসতেন

১৯৭২ সালে বাংলা দেশে সাধারণ নির্বাচনে প্রয়াত: নেতা বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। তিনি যখন সংসদ অধিবেশনে যোগ দানের জন্য ঢাকা যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সাথে সৌভাগ্যক্রমে আমার চট্টগ্রামে দেখা হয়, তখন তিনি আমায় বলেছিলে—

—'' সংসদে জুম্ম জনগনের জাতীয় অস্তিত্বের রক্ষাকবচ স্বায়ত্ব শাসনের দাবী অবশ্যই উত্থাপণ করবো। আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই দাবী পূরণ করতে হবে। আপনার গ্রামের জুম্ম জনগনকে অবশ্যই এই দাবীর জন্য ঐক্যবদ্ধ করবেন।''

জুম্ম জাতীর কর্ণধার মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ছিলেন নিঃস্বার্থ, বিনয়ী, মিতব্যয়ী সাহসী সৎ ও মহান দেশপ্রেমিক। এবার চট্টগ্রামে তিনি আমায় ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে মিতব্যয়ী হওয়ার উপদেশ দেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বশীভূত করার জন্য মন্ত্রিত্ব ও লক্ষ লক্ষ টাকা সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থ ও সৎ এম এন, লার্মা সব কিছুই ঘৃনাভরে প্রত্যাখান

করে বলেছিলেন :— মন্ত্রিত্ব বা লক্ষ টাকা আমাকে নয়, জুম্ম জনগণকে দেওয়া হোক।

প্রয়াত: নেতা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে ছিলেন : তাই তো তিনি দশ ভিন্ন ভাষা ভাষি জুম্ম জাতির স্বপ্ন দেখতেন যেমনি তিনি স্বজাতিকে ভালো বাসতেন তেমনি অন্য জাতির প্রতিও তাঁর সমতুল্য সম্মান ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তার এই মহান মানবতাবোধ ছিল বলেই তিনি দশ ভাষা ভাষি জুম্ম জাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মানবতাবাদী পতাকার তলে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাইতো তিনি জুম্ম জাতির কাছে অতি বরনীয় নেতা ও পথ প্রদর্শক।

আজ ১০ই নভেম্বর। ১৯৮৫ সাল। সেই ভদ্রলোক আমার মত হাজার হাজার অশিক্ষিত— অল্প শিক্ষিত জুম্মদের মনে বাঁচার প্রেরনা—জুগিয়ে ছিলেন— ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামী মুখর করেছিলেন ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সংগ্রামী আহবান দিয়েছিলেন—সেই বিনয়ী ও সৎ ভদ্রলোকটি আজ আমাদের মাঝে —নেই। জাতীয় বেইমান গিরি প্রকাশ দেবেন পলাশচক্র তাঁকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি আদর্শ বিনাশ করে দিতে পারেনি। এ নীতি আদর্শ অজেয় ও অমর। তাঁর অমর নীতি আদর্শ আমাদের সবায়ের সংগ্রামী জীবনে চির পাথেয় হয়ে থাকুক। আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রনাম জানাই।

মুক্তির ডাক

—শ্রীবিশ্ববিনাশন

আমরা জুম্মজাতি নেই কোন অধিকার
বঞ্চিত নিপীড়িত তবু চাই বাঁচিবার।
মুক্তির সংগ্রামে রঞ্জিত বিংশ শতাব্দী
প্রেম-প্রীতি ভালবাসা কলুষিত অতি।
এগিয়ে চলেছে লাঞ্ছিত মানবতা মুক্তির সাধনায়
জ্বলিছে জুম্মজাতি শোষনের বহ্নি শিখায়।
আর নয় বসে থাকা এসেছে জাগরণ
জেগেছে সবাই জেগেছে জুম্ম মরনপণ।
তুলে নিয়ে হাতিয়ার গড়িতে শোষনহীন সমাজ
নিয়েছে বজ্রশপথ ছিঁড়বে শোষণের ফাঁস।
দুর্বার এই লালমার হৃদয়ে গর্জে উঠেছে বাঘ
উন্নত শিরে উঠে এস বীর এসেছে মুক্তির ডাক।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ

—শ্রীরবি

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম, মুরুং, খিয়াং, খুমী, পাংখো, চাক, লুসাই—ভিন্ন ভাষা ভাষি এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমুসলিম জুম্ম জাতির আবাস ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। সরল ও সহজ জীবনের অধিকারী এই জুম্ম জাতির মোট জন সংখ্যার ৯০%. জনই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর অবশিষ্টাংশ খৃষ্টান ও সনাতন হিন্দু ধর্ম অনুসারী। কিন্তু কালের কুটিল চক্রে আজ এই অমুসলিম জুম্ম জাতি উগ্র-বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদীর করাল গ্রাসে পতিত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এসে উপনীত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। মুসলিম লীগের দাবিতে মুসলমান অধ্যুসিত অঞ্চল ও প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান আর বাদ বাকী যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আসতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিয়ে ভারত—এই দুটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যায়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের জালে আবর্তিত হয়ে কোন এক রহস্য জনক কারনে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলমানের আবাসভূমি পাকিস্তানেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৪১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জন সংখ্যা ছিল ২,৭৭,৫৫৩ জন। তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭,২৭০ জন। আবার এই মুসলমানদের মধ্যে অর্ধেকের মত ব্যবসায়ী ও চাকুরী জীবি ছিল। ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জন সংখ্যার ধর্মভিত্তিক হার ছিল নিম্নরূপ—

জুম্ম—	৯৭.৫%.
বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান—	২.৫%.
অমুসলিম—	৯৮.৫%.
মুসলিম—	১.৫%.
বৌদ্ধ—	৮৫.৫%.
অন্যান্য—	১২.০%

ষড়যন্ত্রের শুরু

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছনে কি রহস্য (ষড়যন্ত্র ?) নিহিত তা অদ্যাবধি উদ্‌ঘাটিত হয়নি। দেশ বিভক্তির সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জন সংখ্যার ১.৫%. মুসলমান হওয়া সত্বেও *Bengal Boundary Award Commission* এর চেয়ারম্যান *Sir Cyrill Radcliffe* ভারত উপমহাদেশ বিভক্তি করনের মৌলিক নীতি চূড়ান্ত ভাবে লঙ্ঘন করে এক কলমের খোঁচায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অসহায় জুম্ম জাতিকে পাকিস্তানের জলন্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করে। জুম্ম জনগণ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির 'সংগ্রাম পরিষদের' নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর দপ্তর রাঙ্গামাটিস্থ ডেপুটি কমিশনার এর কার্যালয়ে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বালুচ রেজিমেন্ট কর্তৃক রাঙ্গামাটি দখল না হওয়া অবধি ২০শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই পতাকা উড্ডীন ছিল। [সূত্রঃ *An Account of C H T, JSS*]

বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারনের জন্য *Boundary Award Commission* গঠন করা হয়। আর এই কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে *Sir Cyrill Radcliffe* নিযুক্ত হন। দেশ বিভাগের মৌল নীতি যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও ঠিক ভাবে কার্যকরী হয় এই মর্মে দাবী সম্বলিত একটি স্মারক লিপি জুম্ম জনগনের পক্ষে জন সমিতির সংগ্রাম পরিষদ *Boundary Award Commission* এর কলকাতা বৈঠকে উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু জুম্ম জাতির দুর্ভাগ্য— কমিশনের চেয়ারম্যান *Radcliffe* বৈঠকে উপস্থিত না হয়ে রাওয়ালপিন্ডি থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য নির্দ্ধারন করে দেয়। [সূত্র – *An Account of C H T, JSS*]।

ভারত বিভাগের মূল নীতি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতেই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা; বস্তুতঃ প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৪৭ সালের জুন, জুলাই ও ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত ভারতেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর পাঞ্জাবের ফিরোজপুর ও জিরা জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সম্পর্কে *Sir Cyrill Radcliffe* এর

সেক্রেটারী *Christopher* কর্তৃক পাঞ্জাবের গভর্নর *Sir Evan Jenkins* এর কাছে ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ইং তারিখে পাঠানো নোট ও ম্যাপসীটে স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করা আছে। ফিরোজপুর জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা বেশী হলে ও শিখদের জনসংখ্যা নগন্য ছিল না। তাই বৃটিশ সরকার এবং ভাইসরয় স্বয়ং শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। ফলে যদি ও *Christopher* কর্তৃক ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল প্রেরীত নোট ও ম্যাপসীটে ফিরোজপুর ও জিরা পাকিস্তানের অংশ হিসাবে ধরা হয়েছিল, তবু ও কোন এক রহস্যের কারণে *Lord Ismay* এর লিয়াজো মেজর *Maclaugh Lin Shart* এর গোপন চিঠি প্রাপ্তির পরই শেষ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর *Sir Federick Burrows* এর মতামত তোয়াক্কা না করেই লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, রেডক্লিফ ও লর্ড ইস্‌মে ৯ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল একত্রে বসে পাঞ্জাবের জিরা ও ফিরোজপুর জেলা দুটির বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তভুক্ত করে দেয় [সূত্র – *Amrita Bagar Patrika, Oct, 1980*]। এ কারণেই অনেক দেরীতে ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে—পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের চক্রান্তে তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদাসীনতা ও জুম্ম জনগণের জাতীয় নেতৃত্বের সংকীর্ণতা ও অদূরদর্শিতার কারণে শেষ পর্যন্ত অ-মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অর্ন্তভুক্ত হলো। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জুম্ম ভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

পাকিস্তান আমল

"পাকিস্তান ইসলামিক দেশ, ইসলাম সংখ্যালঘু জাতি সত্তাকে ইসলামেরই পবিত্র আমানত মনে করে। পাকিস্তান ও ইসলামিক দেশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতি সমূহকে পবিত্রতার সহিত রক্ষা করে যাবে"—গভর্নর জেনারেল সায়েদ ই আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে জুম্ম নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে উপরোক্ত কথাগুলো ঘোষণা করে যান। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তার উগ্র ধর্মান্ধ ষোলস বেশী দিন আর লুকিয়ে রাখতে পারে নি। যেহেতু পাকিস্তান মুসলমানদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু জন্ম লগ্ন থেকেই উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার অ-মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এই ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শুরু হলো—পাইকারী ভাবে জুম্ম জনগণকে ভারতপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত এবং এ অজুহাতে ব্যাপকভাবে ধর পাকড় ও বিভিন্ন প্রকারের নিপীড়ন, নির্যাতন করা। ফলতঃ জাতীয় জীবনে নেমে এল এক চরম বিপর্যয়। উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের লক্ষ্যে একটার পর আরেকটা হীন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। এসব হীন কার্যক্রম এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে—

১) ১৯৪৮ সালে *The Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation, 188* । (*111 of 1881*) বাতিল করে দেওয়া হয়।

২) পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকেই বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করা হতে থাকে।

৩) ১৯৬০ সালে কর্ণফুলী বহুমুখী জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়।

৪) ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫) সাংবিধানিক আইন পদদলিত করে জুম্ম জনগণের অজ্ঞাতসারে ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের রক্ষা কবচ "উপজাতীয় বিশেষ এলাকার" মর্যাদা বাতিল করে দেয়া হয়।

৬) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি যথাযথ ও কঠোর ভাবে কার্যকর করা হয় নি।

৭) ব্যবসা বাণিজ্যে একচেটিয়া ভাবে বহিরাগতদেরকে সুযোগ সুবিধা দেয়া হতে থাকে এবং স্থানীয় প্রশাসনে বহিরাগত বাঙ্গালীদেরকে নিয়োগ করতে শুরু করে।

পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি অক্ষুন্ন রেখে ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন বিধি (*India Act of 1935*) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম "*Excluded Area*" হিসেবে শাসন করতে থাকে। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে ও *Excluded Area* হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। ১৯৫৮ সালে এই সংবিধান বাতিল হয়ে যায়। তবে ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই শাসনতন্ত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্বের মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

১৯৬৩ সালের জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের বহির্ভূত এলাকার মর্যাদা বাতিল করার বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করে এজন্য বার বার আবেদন জানাতে থাকে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একদিকে কাপ্তাই বাঁধে প্রায় একলক্ষ লোক উদ্বাস্তু

হল, অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম অস্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার ফলে জুম্ম জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার অভাবে হাজার হাজার জুম্ম নরনারী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বার্মাতে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করলো। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক চাপ এড়িয়ে যেতে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত অবস্থা আয়ত্বে আনার উদ্দেশ্যে পাকিস্থান সরকার ১৯৮০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকর করার পদক্ষেপ স্থগিত রাখে। তবুও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'বহির্ভূত এলাকা'র মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার পরে কার্য্যতঃ এই শাসন বিধি অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেন না পরবর্তীতে এই রেগুলেশন আর ঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় নি।

মুসলমানের আবাস ভূমি পাকিস্তানে জুম্ম জনগণ বস্তুতঃ প্রথম থেকেই অনাকাঙ্খিত ও বেমানান ছিল। একারনে জন্ম লগ্ন থেকেই পাকিস্তান সরকার যেমনি জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক উপায়ে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের হীন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে পাকিস্তান সরকার পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভেই কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত নানিয়াচর, লংগদু থানার অন্তর্গত লংগদু এবং বান্দরবান মহকুমার নাক্ষ্যংছড়ী থানা এলাকায় এক হাজার মুসলমান পরিবারের বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। এই বেআইনী অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ প্রতিনিধির মাধ্যমে কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে থাকে। প্রতিবাদের ফলে পাকিস্তান সরকার বেআইনী ভাবে মুসমান পরিবারের বসতি স্থাপন বন্ধ করলেও যারা ইতি মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেছে যে সব মুসলমান পরিবারদেরকে আর ফেরত নেওয়া হয় নি।

বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশ সাময়িক কালের জন্য বন্ধ রাখলেও উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার ষাট দশকের প্রারম্ভ থেকেই তার ইসলামিক সম্প্রসারন-বাদের নগ্নরূপ উন্মোচন করতে থাকে। ফলে আবার বেআইনী বাঙালী মুসলমানের অনুপ্রবেশ শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল—রামগর মহকুমাধীন তুবলছড়ী, বেলছড়ী, মানিকছড়ী ও রামগড় ইউনিয়নে দুই হাজার মুসলমান পরিবার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিনাঞ্চল—বান্দরবন মহকুমার লামা থানার অন্তর্গত আলিকদম ও লামা ইউনিয়নে কয়েকশত মুসলমান পরিবারকে সরকারী উদ্যোগে পুণর্বাসিত করা হয়। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র বিশেষতঃ ইতিপূর্বে যে সমস্ত এলাকায় বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেই সব এলাকায় ভিতরে ভিতরে ক্রমাগত বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এভাবে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত প্রায় ৬০(ষাট) হাজার বাঙ্গালী মুসলমান বেআইনী ভাবে সরকারের সাহায্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে। এভাবে আস্তে আস্তে ইসলামিক ধ্যান ধারনা, আচার আচরন, আদব কায়দা জুম্ম জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

প্রসঙ্গত ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে—কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৯৯, ৯৭৭ জন (অর্থাৎ ১৭,৩০৬ পরিবার) জুম্ম নরনারী উদ্বাস্ত হয়ে পড়ে। ১৭৬০৮৪০ একর জমি (তন্মধ্যে ৫৭,০০০ একর উৎকৃষ্ট ধান্য জমি) জলমগ্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট উৎকৃষ্ট ধান্য জমি ১,০৭,৩০৪, ৬৪ একরের মধ্যে ৫২% জমি কাপ্তাই হ্রদে ডুবে যায়। (সূত্র—পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গেজেটিয়ার ১৯৭৭) পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যায়। হাজার হাজার উদ্বাস্ত পরিবার সুষ্ট পুণর্বাসনের অভাবে যাযাবর জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়; অথচ ঠিক সে সময়ে পাকিস্তান সরকার কয়েক হাজার বেআইনী অনুপ্রবেশ কারী মুসলমান পরিবারদের সুষ্ট ভাবে পুণর্বাসন দিতে কোন দ্বিধা বোধ করেননি। শুধু পুনর্বাসন নয় এসব অনুপ্রবেশকারী পরিবারদের জন্য মসজিদ নির্মান ও মক্তব চালু করার খাতে প্রচুর অর্থবরাদ্ধ করতে থাকে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়া সত্বেও বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্য সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়নি। জন্ম লগ্ন থেকেই ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান আমলে ইসলামিক সম্প্রসারনবাদী নীতি কতটুকু সম্প্রসারিত হতে পেরেছে তা আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জন সংখ্যার একটা হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

লোক সংখ্যা

উৎস	সাল	মোট জন সংখ্যা	অমুসলিম	মুসলিম	মুসলিম জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার
আদম সুমারী	১৯৪১	২,৪৭,০৫৩	২,৩৯,৭৮৩	৭,২৭০	২.৯৪%
আদম সুমারী	১৯৫১	২,৮৭,২৭৪	২,৬৯,১৭৭	১৮,০৭০	৬.২৯%
আদম সুমারী	১৯৬১	৩,৮৫,০৭৯	৩,৩৯,৭৫৭	৪২,৩২২	১১.৭৭%
জন সংহতি সমিতির সংগৃহীত তথ্য	১৯৭০	—	—	৬৬,০০	

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল। সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ও খুবই অনুন্নত। ফলে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল সমূহে লোক গণনা কোন সময়েই সঠিক হতে পারেনা। তাই প্রতিটি আদম শুমারীতে জুম্ম জনসংখ্যার একটা বড় অংশ গণনায় বাদ পড়ে যায়। সুতরাং ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে অমুসলিম জনসখ্যার যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা সঠিক হতে পারে না। অমুসলিম জনসংখ্যা আর ও সঠিক হওয়াটা যুক্তি সঙ্গত।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারনে ১৯৬১ সালের পর পাকিস্তান আমলে আর কোন আদম শুমারী হয়নি। তাই ১৯৬১ সালের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যার হিসেব আর সরকারী পর্যায়ে পাওয়া যায়নি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশ কারীদের সংখ্যা ৬০ (ষাট) হাজারের কম হতে পারেনা। এসব বেআইনী অনুপ্রবেশ কারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল— লংগদু, মারিশ্যা (বাঘাইছড়ী), রামগড়, মাটিরাংগা, তুবলছড়ি, মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ী এবং দক্ষিনাঞ্চল—লামা, বান্দরবান, নাক্ষ্যংছড়ী এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকে। তাছাড়া রানী কালিন্দী রানীর শাসনামলে আনা [যাদের কে স্থানীয় ভাবে পুরোন বস্তী বাংগালী মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়া হয়] বাঙ্গালী—মুসলমানদেরকে এহিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি। এসব পুরোন বস্তী বাঙ্গালী মুসলমানদের মোট জনসংখ্যা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৬০০০ (ছয়হাজার) এর অধিক হতে পারে না। কাপ্তাই বাঁধে জলমগ্ন হওয়ার পর পুরোন বস্তী বাঙ্গালী মুসলমানেরা মারিশ্যা [বাঘাইছড়ী], খাগড়াছড়ী, পানছড়ি, শিয়ালবুক্যা ও চন্দ্রঘোনা এলাকায় নতুন করে বসতি স্থাপন করে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৫% ছিল মুসলমান। তাছাড়া এদের মধ্যে একটা অংশ ছিল চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ী। অথচ ১৯৬১ সালের লোক গণনায় মুসলমানের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১৮,০৭০ (আঠার হাজার সত্তর জন)। এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা ৭৬,০০০ এ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পঞ্চাশ দশকের তুলনায় মসজিদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তদুপরি বিভিন্ন অঞ্চলে জুম্ম জনগনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ইসলামী প্রভাব নানা ভাবে প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। বলাবাহুল্য পাকিস্তান আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের ভিত্তি পাকা পোক্ত হয়ে উঠে।

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করে থাকে কিন্তু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার এইচ. টি. ইমাম ও আওয়ামী লীগের নেতা সাইদুর রহমান এর চক্রান্তে জুম্ম জনগণকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। এমন কি আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা শ্রী কে. কে. রায় যিনি ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন, তাকে মুক্তি যুদ্ধের সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চক্রান্ত করে গ্রেফতার করা হয়। তা সত্বেও জুম্ম জনগণের আশা ছিল এবারে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে—জাতীয় অস্তিত্বের উপর আর কোন প্রকারের হুমকি থাকবে না। কিন্তু জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা আওয়ামী লীগ সরকার সব ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার যা করতে সাহস পায়নি তাই বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট ও সক্রিয় হয়ে উঠে। শুরু হল— উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার হীন ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে—

১) সুপরিকল্পিত ভাবে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠন, শারীরিক নির্যাতন, হত্যা ধর্ষণ এবং বাড়ী জ্বালাইয়ে দেওয়া হয়;

২) পাইকারী ভাবে ধরপাকড়, জেল জুলুম ও বন্দী শিবিরে অত্যাচার উৎপীড়ন করা হয়;

৩) ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্বা চিরতরে লুপ্ত করে দেওয়া হয়;

৪) তথাকথিত বৈদেশিক আক্রমণের দোহাই দিয়ে ১৯৭৩ সালে দীঘি নালা, রুমা ও আলিকদম (লামা থানার অন্তর্গত) নামক স্থানে তিনটি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়; সর্বোপরি কাপ্তাই সংলগ্ন ধল্যাছড়ী নামক স্থানে একটা নৌ ঘাঁটি স্থাপন করা হয়;

ক) সামরিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়;

৬) বে আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করা হতে থাকে

৭) জুম্ম জনগনের উপর উগ্রবাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়;

৮) বৌদ্ধ বিহার (মন্দির) ধ্বংস ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন-নিপীড়ণ করা হয় এবং জুম্ম জনগণের ধর্মীয় জীবনে আঘাত হানা হয়।

এসব অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠে এবং গণপ্রতিনিধির মাধ্যমে ও নানা ভাবে বার বার কড়া প্রতিবাদ জানাতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা লুপ্ত করে দেয়া ও বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করণের বিরুদ্ধে বার বার গণপ্রতিনিধির মাধ্যমে জুম্ম জনগণ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে থাকে। আর অন্যদিকে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষনের জন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টির আবেদন জানিয়ে সরকারের নিকটও বার বার প্রতিনিধিত্ব করা হতে থাকে। কিন্তু জুম্ম জনগণের সব আশা আকাঙ্খা চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। আর জন জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

এভাবে উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আওয়ামীলীগ সরকার জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সাংবিধানিক উপায়ে লুপ্ত করে দেওয়ার পর একদিকে নির্মম ভাবে দমন নীতি চালাতে থাকে আর অপর দিকে বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের নগ্ন থাবা বিস্তার করে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্ম ভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথ আরও সুগম ও সুনিশ্চিত করে তোলে।

জিয়াউর রহমান শাসনামল (১৯৭৬-১৯৮১)

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট, এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ সরকারের পতন ঘটে। এরপর ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ সাল সিপাহী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বার বার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও জুম্ম জনগণের ভাগ্য কিন্তু পরিবর্তন হতে পারেনি। বরঞ্চ জাতীয় অস্তিত্বের বিলোপ সাধনের ষড়যন্ত্র দিন দিন জোরদার হয়ে উঠতে থাকে তাই জিয়া সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা নিরূপন ও সমাধানের প্রাধান্য না দিয়ে তার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে। তথাকথিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আড়ালে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী আধিপত্য বিস্তারের হীনষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপের মধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে—

১) ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তথাকথিত উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। আর এসব উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জিয়া সরকার একদিকে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়া ও অন্যদিকে জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাতে থাকে;

২) ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-বাহিনী নিয়োগ করে সামরিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়;

৩) ১৯৭৭ সাল থেকে তথাকথিত যৌথ গ্রাম ও আদর্শ গ্রামের নামে বন্দী-শিবির প্রতিষ্ঠা করে জুম্ম জনগণকে বন্দুকের নলের মুখে কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য করা হতে থাকে;

৪) ১৯৭৭ সালে জুম্ম 'দুলা' (প্রতি-ক্রিয়াশীল ও দালাল) দের নিয়ে ট্রাইবেল কনভেনশন (উপজাতীয় সম্মেলন) নামে একটি দালাল সংস্থা গঠন করা হয়। এবং ট্রাইবেল কন-ভেনশনকে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করতে থাকে;

৫) হত্যা, ধর্ষন, লুঠপাট, জেল-জুলুম, অগ্নিসংযোগ অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন করা হতে থাকে;

৬) ভিন্ন ভাষা ভাষি দশ জুম্ম জাতির মধ্যে বিভেদ করে শাসন করার নীতি নির্লজ্জ ভাবে প্রয়োগ করা হয়;

৭) সশস্ত্র বাহিনীর ছত্রছায়ায় বেআইনী অনুপ্রবেশ কারীদের দ্বারা ২৮ শে মার্চ, ১৯৮০ সালে কলমপতি ইউনিয়নে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করে

গনহত্যা করা হয় ;

৮) বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপর নির্যাতন করার মাধ্যমে ধর্মীয় জীবনে আঘাত হানা হয় ;

৯) আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে স্বদেশে ও বিদেশে অপপ্রচার চালানো হতে থাকে ;

১০) কৃত্রিম অর্থসংকট সৃষ্টি ও চলাচলে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন থেকে জুম্ম জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করা হতে থাকে।

১১) ১৯৮০ সালে সংসদে *'The Disturbed Area Bill of 1980"* পাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপদ্রুত এলাকা হিসেবে ঘোষনা করা হয়। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা, পাইকারী হারে গ্রেপ্তার ও সীমাহীন নির্যাতন উৎপীড়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

১২) মহাল ছড়ি থানার অন্তর্গত মহাল ছড়িতে একটা *Counter Insurgency*-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ সমূহ কার্যকরী হওয়া সত্বেও যখন জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের ন্যায্য সংগ্রাম 'আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন' বানচাল করে দেওয়া সম্ভব হল না, তখন উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী জিয়া সরকার তার সম্প্রসারণবাদের নয় চেহারা সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করে ফেলে। পাকিস্তান সরকার ও আওয়ামীলীগ সরকারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে জিয়া সরকার অতি দ্রুত গতিতে পদক্ষেপ গ্রহন করতে থাকে। এর উদ্দেশ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের গোড়ার দিকে এক শক্তিশালী গোপন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছে—ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার, উপ-প্রধান মন্ত্রী জামাল উদ্দীন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্ণেল মুস্তাফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার আবদুল আওয়াল, পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার আলী হায়দার খান ও ২৮তম পদাতিক বাহিনীর জি ও সি মেজর জেনারেল মঞ্জুর।

শুরু হল আর এক জঘন্য ইতিহাস। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের বিলোপ সাধন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারনবাদ প্রতিষ্ঠার হীন ষড়যন্ত্র। বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করণ, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করণ, ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ইসলামিক প্রচার কেন্দ্র স্থাপন এর কার্যক্রম সুপরিকল্পিত ভাবে সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকায় বাস্তবায়িত হতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে উক্ত গোপন কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে—"১৯৮০ সালের মধ্যে ৩০,০০ (ত্রিশ হাজার) বাঙ্গালী মুসলমান পরিবার (অর্থাৎ ৩০,০০০ × ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার=১৮০,০০০) কে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুর্নবাসন করা হবে। এই পুর্নবাসনের কাজ দুই পর্যায়ে শেষ করে নিতে হবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে—জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে এবং এসব কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ভূমিহীনদেরকে সংগঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহন করা।"

ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের এই জঘন্য পরিকল্পনা অতিদ্রুত গতিতে বাস্তবায়িত হতে থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্র স্থানীয় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা হলো জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক কার্যকরী কমিটি। আর এই সব কমিটির মাধ্যমে ভূমিহীন-দেরকে সংগঠিত করা হতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে ইচ্ছুক ভূমি হীনদের কাছে ঘোষনা করে দেয়া হল যে—প্রত্যেক পরিবারকে বিনামূল্যে পাঁচ একর পাহাড়, পাঁচ একর সমতল ও উঁচু ধান্য জমি, এক জোড়া বলদ, সার ও বীজ, এবং ছয়মাসের রেশন এক কালীন ৩,৬০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত সরকারী গোপনীয় দলিল পত্রাদি এই ঘৃনিত চক্রান্তের সত্যতা যথার্থই নিরূপন করে—

Secret Memorandum

Memo. No. 665—C

To

Mr.......................

Commissioner

Chittagong Division.

It has been declared that landless/river erosion affected people from your district will be settled in the Chittagong Hill Tracts (CHT). The settlement will be done in selected Zones and each family will be given Khas land free of Cost according to the following scale :—

Plain land—2॥০ acres

Plain and bumpy land—4 acres

Hilly land—5 acres.

It has been decided that you will send 5,000 families. You are requested to collect particulars of intending and suitable families from the Chairman of the concerned union parishad and furnish list to the Deputy Commissioner, CHT, through a special messenger by the 30th Sept. 1980 at the latest...

....

It is desire of the Government that the concerned Deputy Commissioner, will give priority to the work and make the Programme a success.

....

....the Government.

CHITTAGONG DIVISION.

Saifuddin Ahmed

Secret

The Government of the People
Republic of Bangladesh.
Office of the Deputy Commissioner, CHT
Memo. No 1025(1)C Dt. Rangamati
From: Mr. Ali Haider Khan
Deputy Commissioner,
Chittagong Hill Tracts.

To

Mr.....
Sub—Settlement of land less
non-tribal families in
CHT—2nd phase.

With reference to our discussion in Dacca 21. 8. 80 and reference to the Chittagong Division Commissioner's letter No. 66 (1) C dt. 4. 9. 80 on the above noted subject, I furnish below a guide line regarding the programme of settlement of landless non-tribal families from other districts in CHT.

1. Selection of families should be completed by 20th Oct. 80.

2. The Chairman of the Union Parishad Concerned will issue identity cards to the selected families in the form enclosed at annexure (A)

3. .....

4. At the reception centre an officer will take care of the settlers and will make arrangement for their journey to rehabilitation blocks.

5. At the reception centre settlers will be given taka 200/- per family and on their arrival at rehabilitation blocks they will be paid another instalment of Taka 500/—. After that, each family will be given further grants... ... ...

6. In rehabilitation blocks each family will be settle with Khas land at the following rate :—

1) Five acres hilly land.
2) 2·5 acres paddy land.
3) Four acres bumpy land.

... ...

Sd/
Ali Haider Khan
D. C
Chittagong Hill Tracts.

Secret

The Government of the People
Republic of Bangladesh.
Office of the Deputy Commissioner, CHT
Memo. No 1025(1)C Dt. Rangamati
From: Mr. Ali Haider Khan
Deputy Commissioner,
Chittagong Hill Tracts.

To

Mr.....

Sub—Settlement of land less non-tribal families in CHT—2nd phase.

With reference to our discussion in Dacca 21. 8. 80 and reference to the Chittagong Division Commissioner's letter No. 66 (1) C dt. 4. 9. 80 on the above noted subject, I furnish below a guide line regarding the programme of settlement of landless non-tribal families from other districts in CHT.

1. Selection of families should be completed by 20th Oct. 80.

2. The Chairman of the Union Parishad Concerned will issue identity cards to the selected families in the form enclosed at annexure (A)

3. .....

4. At the reception centre an officer will take care of the settlers and will make arrangement for their journey to rehabilitation blocks.

5. At the reception centre settlers will be given taka 200/- per family and on their arrival at rehabilitation blocks they will be paid another instalment of Taka 500/—. After that, each family will be given further grants... ... ...

6. In rehabilitation blocks each family will be settle with Khas land at the following rate :—

1) Five acres hilly land.
2) 2·5 acres paddy land.
3) Four acres bumpy land.

... ...

Sd/
Ali Haider Khan
D.C
Chittagong Hill Tracts.

পরিচয় পত্র

সার্টিফিকেট — প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মোঃ ডাঃ [illegible]
[illegible]

[illegible]

Countersigned
[illegible]

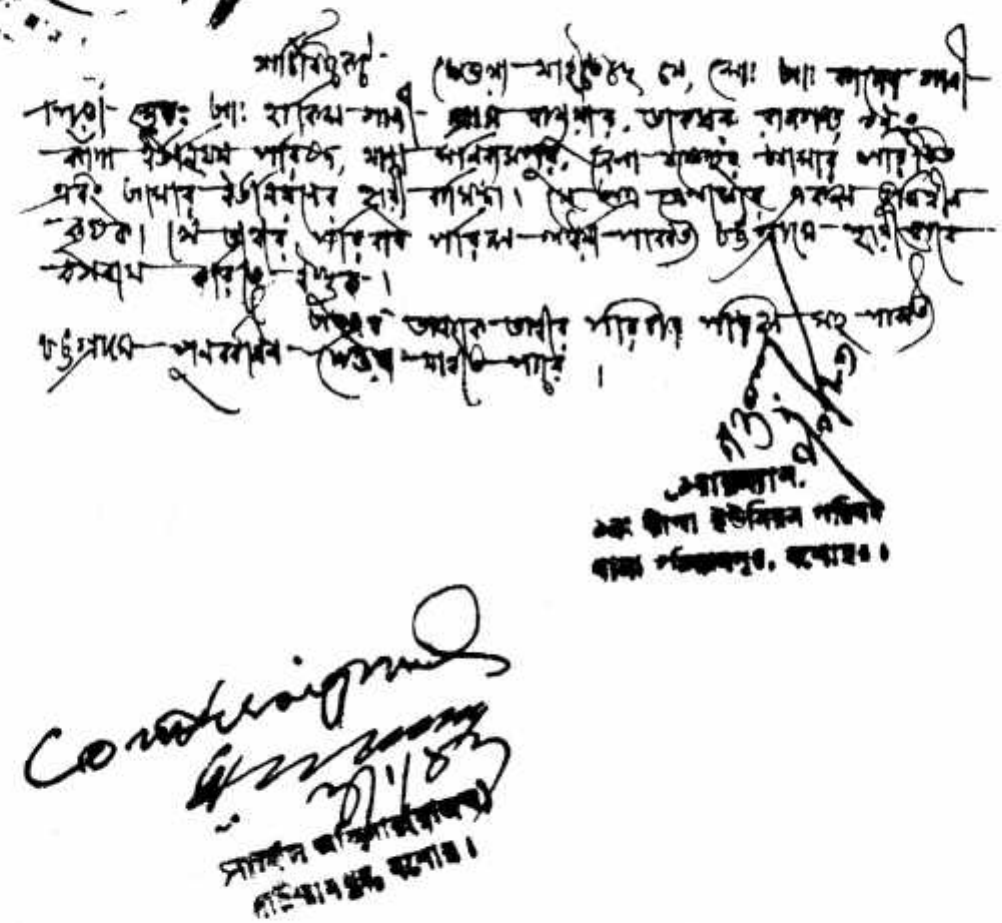

Government of Bangladesh
office of the Deputy Commissioner,
Jessore.

Relief Deptt.

Memo No—1295/PR Date—25. 11. 81

To
The office-in-Charge,
Haji Camp, Chittagong.

Sub— Settlement of non-tribal landless families in Chittagong Hill Tracts.

Ref :— Divisional Commissioner, Chittagong, D.O. No. 596/C Dated,—25. 7. 81

3 (three) families consisting 16 (sixteen) members whose petition with photograph have been duly attested are proceeding to Haji Camp Chittagong for their rehabilitation Chittagong Hill Tracts.

The families being landless deserves rehabilitation.

Name of Head of the family	No. of members
1) Md. Azizur	6 (six) members.
2) Md. Abdul Barik	3 (three "
3) Md. Moslem Ali	7 (seven) "
	16 (sixteen)

M. I Khan
23/11/81

23/11/81

For Deputy commissioner
Jessore.

23.11.81

উচ্চ পর্যায়ের গোপন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমতঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি করতে ইচ্ছুক ভূমিহীনদের তালিকা ভুক্ত করে ও যথারীতি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের পরিচয় পত্রসহ স্থানীয় ডেপুটী কমিশনারের সুপারিশক্রমে এসব ভূমিহীনদেরকে চট্টগ্রামের হাজীক্যাম্পে ও রেলষ্টেশন সংলগ্ন অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয়। তারপর এখান থেকে বিভিন্ন দলে ভাগকরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে এসব ভূমিহীন বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনাধীনে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য উপরোক্ত গোপনীয় দলিল পত্র তথাকথিত পুনর্বাসনের পুরো প্রক্রিয়াটাই স্পষ্ট করিয়ে দেয়। আর এভাবে জিয়া সরকারের আমলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ছত্রছায়ায় প্রথম পর্য্যায়ে ২০,০০০ (বিশ হাজার) পরিবার [অর্থাৎ ২০,০০০×৬ সদস্য প্রতি পরিবার=১,২০,০০০] কে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল রামগড় ও রামগড় এলাকাধীন মানিকছড়ি, গুইমারা ও মাটিরাংগা ; খাগড়াছড়ী এলাকাধীন—পানছড়ি ও দীঘিনালা ; মহালছড়ী থানার অন্তর্গত—মহালছড়ী, মৌবাছড়ী ও মাইছছড়ি ; নানিয়াচড় থানার অন্তর্গত—নানিয়াচড়, বুড়ীঘাট, ও বাকছড়ি ; কতোয়ালী থানার অন্তর্গত কলমপতি ইউনিয়ন, লংগদু থানার অন্তর্গত লংগদু, মেরুং ও আটারকছড়া এবং দক্ষিনাঞ্চল—বান্দরবন, আলিকদম ও নাক্ষ্যংছড়ীর বিভিন্ন এলাকায় তথাকথিত পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ করনের প্রথম পর্য্যায়ের কাজ ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সমাপ্ত হলে আগের অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ শুরুহয়ে যায়। বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন দেওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি পরিবারকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সব সুযোগ সুবিধা দিতে না পারলেও প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারী পরিবারকে যথা সম্ভব জমি হালের বলদ এককালীন অর্থ, বীজধান, সার দেওয়া হয়ে থাকে। সর্বোপরি অনুপবেশকারীদের প্রতিটি এলাকায় বসতি করার সাথে সাথে মসজিদ ও মক্তবের জন্য টাকা বরাদ্ধ করা হয়, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহ করা হয় পানীয়জলের জন্য নলকূপ বসিয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি এদের নিরাপত্তার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের থেকে গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন করে দেয়া হয়। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্পতো আছেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে একটি পার্বত্য অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের এক তৃতীয়াংশ রিজার্ভ ফরেষ্ট। চাষযোগ্য জমি খুবই কম। উৎকৃষ্ট খাস্য জমির মধ্যে ৫২% জমি কাপ্তাই হ্রদে ডুবে গেছে। তাহলে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠে যে—হাজার হাজার মুসলমান পরিবারকে বাংলাদেশ সরকার কোথায় পুনর্বাসন দিয়ে দিচ্ছে? ইহা খুবই স্পষ্ট যে—সামরিক সন্ত্রাস, দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং যৌথ খামার ও আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে নিজস্ব ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে সে স্থানেই হাজার হাজার বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারদের বসতি দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে—বৃটিশ আমলে একটা জুম্ম পরিবারের সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) একর পর্যন্ত জমি নিজ দখলে রাখার অধিকার ছিল। পাকিস্তান আমলে এটা কমিয়ে দিয়ে ১০(দশ) একর করে দেয়া হয় আর বর্তমানে তা আরও কমিয়ে দিয়ে ৫(পাঁচ) একর পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই আইনটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এক জন বাঙ্গালী পরিবারের ৩০ (ত্রিশ) একর পর্যন্ত জমি ভোগ দখল করার অধিকার রয়েছে। এভাবে জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) একর পর্যন্ত ধার্য্য করে দেওয়াটা অবশ্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাছাড়া ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে অনুপ্রবেশ কারীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুণর্বাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ সরকার এই হীণ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ করনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হতে না হতেই জিয়া সরকারের পতন ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ না হলেও ইতি মধ্যে জিয়া সরকারের বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকদুর এগিয়ে গিয়েছে। একদিকে যেমনি বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ কারীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে, তেমনি অপর দিকে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও প্রচার কেন্দ্রের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হতে পেরেছে। ১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জন সংখ্যা সেই সাথে মসজিদ ও মাদ্রাসার তুলনামূলক চিত্র দেখলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

ক) জন সংখ্যা

উৎস	সাল	মোট জন সংখ্যা	অমুসলিম	মুসলিম	মুসলিম জন সংখ্যা বৃদ্ধিরহার
আদম শুমারী	১৯৬১	৩,৮৫,০৭৯	৩,৩৯,৭৫৭	৪৫৩২২	১১·৭৭%
আদম শুমারী	১৯৭৪	৫,০৮,১৯৯	—	১,১৬,০০০	—
আদম শুমারী	১৯৮১	৭,৫৪,৯৬২	৪,৮৯,৫৪০	২,৬৫,৬২২	৩১.০৪%

* জন সংহতি সমিতির সংগৃহীত তথ্য

খ) মসজিদ—মাদ্রাসা

উৎস	সাল	মসজিদ	মাদ্রাসা
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	১৯৭৯	৪২১	৪
ঐ	১৯৮২	৫২৫	৩৫
ঐ	১৯৮৩	৫২৯	৩৯

এরশাদ শাসনামল (১৯৮১—৮৫)

বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় নেতৃত্বের পরিবর্তন হলেও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির যে ষড়যন্ত্র ধারাবাহিক ভাবে কার্যকরী হয়ে আসছিল তাতে কিন্তু কোন প্রকারের ছেদ পড়েনি। বরঞ্চ এরশাদ শাসনামলে সেই ষড়যন্ত্রের রূপ আরও ভয়াল ও নগ্ন হয়ে উঠে। যার ফলে—

১) সামরিক সন্ত্রাসবৃদ্ধি পেল দিনের পর দিন কম্বিং অপারেশন চলতে থাকে। সামরিক শক্তি আরও বাড়ানো হয়।

২) হত্যা, লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার, জেল জুলুম, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, ঘর বাড়ী জ্বালাইয়ে দেওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

৩) কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্রতর করা হল;

৪) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করা হতে থাকে। ১৯৮১ সালের ২৬শে জুন সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা মাটিরাংগা থানার বেলতলী, অযোধ্যা ও বনরাই বাড়ীতে এবং ১৯৮১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরে ফেনী উপত্যকায় তবলছড়ী, আসালং, তৈলাফাং, বড়নালা ও গৌরাঙ্গ বাড়ীর এলাকা সমূহে দাঙ্গা ও গণহত্যা সংঘটিত করে।

৫) ১৯৮৪ সালে দাঙ্গাল সংগঠন—ট্রাইবেল কনভেনশান পুনরুজ্জীবিত করে জাতীয় পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে;

৬) ৩১ শে মে হতে ৩রা জুন, ১৯৮৪ইং ভূষনছড়া, গোরস্থান ও ছোট হরিনায় গণহত্যা সংঘটিত করা হয়;

৭) সৌদি আরব ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাহায্যে পরিচালিত ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ও ইসলামিক প্রচার কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধিকরা হয় এবং এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করা হয়।

৮) মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ানো হতে থাকে।

৯) বৌদ্ধ ধর্মের উপর নানা ভাবে আঘাত হানা হতে থাকে।

১০) জুম্ম জনগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার অপচেষ্টা চলতে থাকে;

১১) দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির মধ্যে ভেদাভেদ, দলাদলি ও বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টিকরা হতে থাকে;

১২) বিভেদ করে শাসন করার নীতি—ভিন্ন ভাষাভাষি দশ জুম্ম জাতির মধ্যে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হতে থাকে।

১৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উন্নয়নের দোহাই দিয়ে বিদেশী সংস্থা সমূহ থেকে প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকার সিংহ ভাগ সামরিক

তৎপরতা ও বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ করনে ব্যয় করা হতে থাকে;

১৪) বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান পুর্ণবাসনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা হয়;

১৫ ব্যবসা বানিজ্য ও সরকারী বেসরকারী চাকুরীতে বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার যা করতে পারেনি তা সমাধা করার লক্ষ্যে উগ্রজাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ সরকার যে পথ উন্মুক্ত ও সুগম করে দিয়েছে, উগ্র-ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী জিয়া সরকার সেই পথ বেয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলোপের ক্ষেত্র পাকাপোক্ত করে তোলে। আর বর্তমান সামরিক জান্তা জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব বিলোপের পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার শেষ দায়িত্বটুকু পালন করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে *Council Committee on Chittagong Hill Tracts* নামে উচ্চ পর্য্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সঠিক বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়ে থাকে।

এই *Council Committee*'র বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বলিত প্রাপ্ত গোপনীয় দলিলে দেখা যায় যে—এই কমিটি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বেআইনী মুসলমান পুনর্বাসন আইন শৃঙ্খলাসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এই সব প্রাপ্ত গোপনীয় দলিলের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের রাজনৈতিক বিভাগ এর *Memo No. 337 [16]-HA/Poll II Dated, The 3rd November, 1982* মূলে জানা যায় যে—প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৩/১১/৮২ ইং তারিখে বেলা ১১টার সময় *C M L A* সেক্রে টারিয়েট ভবনে *Council Committee*'র এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ উল্লেখ যোগ্য—

DECISIONS

.....

.....

10) Additional supplies of medicine in CHT and Bandarban districts,

—Additional medicine supplies to all the 21 Union medical centres in settlement areas should be ensured.

.....

.....

24) Provisions of shot guns to the VDPS trained from among the settlers of CHT and Bandarban districts.

—Instead of shot guns. ·303 Rifles should be issued to the trained VDPs. Requirement of Rifles should be Communicated by the Commissioner, Chittagong Division/HQ, 24, Infantry Divission to the Army Head Quarters.

25) Allocation of additional fund of TK. 6 crores for settlment of 20, 200 more landless families from the next dry season.

—The purpose is approved. The Ministry of finance & Planning will provide the required additional fund in the current year budget.

.....

... ...

Sd/
H. M. Ershad
NDC, PSc
LIEUTENANT-GENERAL
Chief Martial Law Administrator
&
Chairmen
Council Committee on CHT.

আরেকটি প্রদত্ত দলিলে দেখা যায় যে— জেনারেল এরশাদের সভাপতিত্বে ১৮-৫-৮৩ তারিখে বেলা ১১টার সময় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সেক্রেটারিয়েট ভবনে কাউন্সিল কমিটির এক বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

DECISIONS

.....

.....

7) Administration of settlement Zones in CHT and Bandarban districts.

—Necessary funds shuld be provided by the H/O Home Affairs for training VDP members from amongst the settlers.

8) Continuation of T. R. to settlers of second phase beyond one year at hlaf the prescribed rate.

— a) Test Relief will be provided at the rate of 75·/. wheat and 25·/. rice.

b) Test Relief to settlers of the 2nd phase at the rate of 50./· will bp extended for another period of six months with effect from 1-7-83.

.....

.....

25) Approval of school and appointment of Primary school teachers in settlement Zone areas.

.....

.....

b) Teachers from among the settlers should be appointed in the settlement Zones by relaxing the prescribed qualifications, if necessary such teachers appointed..... should not be transfered outside the districts of CHT and Bandarban for obvious reasons.

.....

.....

Sd/ H. M. Ershad
NDC, PSC,
Chief Martial Law Administrator
&
Chairman
Council Committee on CHT.

অন্য আরেকটি প্রাপ্ত দলিল— স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিভাগ এর স্মারক No. 505 (16)—HA/POII—II Dated, the 19th October, 1983 মূলে জানা যায় যে—প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সেক্রেটারিয়েট ভবনে উক্ত কাউন্সিল কমিটির ২৭-৯-৮৩ তারিখ বেলা ১০টায় সময় এক বৈঠক বসে। বৈঠকে কাউন্সিল কমিটির সভাপতি জেনারেল এরসাদ সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

DECISIONS

SECRET

L. SETTLEMENT PROGRAMME FOR NON TRIBALS FOR 1988—84 :

—The settlement programme of 1983-84 for 15,000 families was approved. Detailed proposals with requirements of funds and food grains in this regard will be submitted by the Commissioner, Chittagong Division through the GOC, 24 Infantry Division. Additional fund for the purpose, if required, will be alloted by

the Finance Division.

Sd/
H, M. Ershad
Ndc, Psc
Lieutenant General
Chief Martial Law Administrator
&
Chairman
Council Committee on CHT.

উপরোক্ত দলিল পত্রে জেনারেল এরশাদ সরকারের হীনমুখোশ সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমান সামরিক সরকার যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারনবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব লুপ্তকরে দিতে বদ্ধ পরিকর তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। আজ এই ফ্যাসীবাদী ও সম্প্রসারণবাদী সামরিক সরকার পূর্বেকার সরকার গুলোর মতো জুম্ম জনগণের তথাকথিত মঙ্গলার্থে বিশ্বের দরবারে কতোই না উন্নয়নের ফিরিস্তি প্রচার করে চলেছে। সরকারী প্রচার মাধ্যমে ও জাতীয় বেইমান 'দুলাদের' মুখদিয়ে জোর প্রচার করে যাচ্ছে যে—বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের সার্বিক উন্নতি মনেপ্রানে কামনা করে। তাই বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতিতে সরকার বিশেষ মনোযোগ রেখেছে আর এই উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনে ব্যয়করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের এই যে প্রচার—এটার মধ্যে সত্যতা কতটুকু আছে তা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে, এসব কিছু প্রকৃত পক্ষে জুম্ম জনগনের উপকার করছে না জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করছে—তা মূল্যায়ন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর একটু আলোকপাত করা দরকার। অবশ্য ইহাবলার অপেক্ষা রাখেনা যে—জুম্ম জনগণের উন্নয়নের দোহাই দিয়ে সামরিক সরকার যা করছে তা পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারনবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই করে চলেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম খুবই পশ্চাৎপদ উপরন্তু কাপ্তাই বাঁধের ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে জুম্ম জনগন বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হতে থাকে। বিশেষতঃ সত্তরদশক থেকেই ভূমিহীন ও জুম্ম চাষীরা নানা পেশা অবলম্বন করে শ্রমিক, মৎস্যজীবি ও বাগান চাষী, শ্রেনীতে পরিনত হতে থাকে। এভাবে জুম্মচাষীদের সংখ্যা দিন দিন কমে যেতে থাকে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যার ৩৮%. হচ্ছে জুম চাষী। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের মাথা পিছু গড় আয় হচ্ছে ১৪৫০.০০ টাকা অন্যদিকে দক্ষিনাঞ্চলে মাত্র ৬৩০.০০টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষিই হচ্ছে প্রধান জীবিকা। কিন্তু এই কৃষি খুবই সরল ও সেকেলের।

বাংলাদেশের সরকার জুম্মজনগণের পশ্চাদপদতাও সঠিক উন্নতির নামে বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়ে থাকে। আর এজন্য জাতি সংঘ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও উন্নয়ন মূলক সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিলুপ্ত প্রায় জুম্ম জনগণের উন্নতি কল্পে বাংলাদেশ সরকারকে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে আসছে। যে সমস্ত বৈদেশিক সংস্থা এযাবৎ আর্থিক সাহায্য প্রদান করে আসছে সে গুলো হল—

১) SIDA (Sweedish International Development Agency)
২) A D B (Asian Development BanK).
৩) UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)
৪) A D A B (Australian Development Assistance Burau)
৫) W H O (World Health organisation)

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ সংরক্ষণ উন্নয়ন ও সঠিক ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে *S I D A* কোটি কোটি টাকার সাহায্য দিয়ে আসছে; অথচ এসব অর্থের অধিকাংশই দূর্নীতি করে একদিকে বাঙ্গালী মুসলমান পুনর্বাসনে ব্যয় করা হচ্ছে এবং বাঙ্গালীদের চাকুরীর সংস্থান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ আহরণ করে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। আবার অন্যদিকে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। যেমন বনায়নের নামে বন জঙ্গল উজার করে জুম্ম জনগণের সশস্ত্র আন্দোলনে অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দোহাই দিয়ে *ADB* সাহায্যে ১৮,০০০ একর এবং বিশেষ পাঁচসালা পরিকল্পনা অধীনে ৫৫,০০০ একর অশ্রেণী ভুক্ত বনাঞ্চলে বনসৃষ্টির কর্মসূচী গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে নেওয়া হয়েছে। ফলতঃ হাজার হাজার একর বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাচ্ছে আর জুম্মচাষীরা চরম সংকটের মুখোমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে।

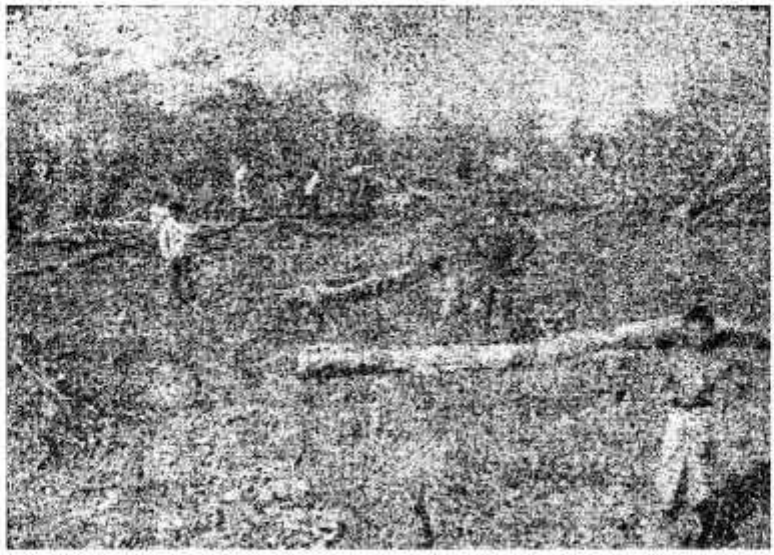

বনায়নের নামে বন ধ্বংস

পশুপালন ও মৎস্য চাষ এবং যৌথ খামার—এ দুটি প্রকল্প *ADB*র আর্থিক সাহায্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে উভয় প্রকল্পে এযাবৎ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এদুটি প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য ও মূলতঃ বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের উন্নয়নে এবং সামরিক খাতেই ব্যয় করা হচ্ছে। পশুপালন ও মৎস্য চাষ পুনর্বাসিত বেআইনী অনুপ্রবেশকারী ও বহিরাগত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই পুরণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্প থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিনা মূল্যে চাষের গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী পালনে সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে। জুম্ম জনগণ এপ্রকল্প বাবদ খুবই কমই সাহায্য পেয়ে থাকে।

অপরাদকে যৌথ খামার হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন বানচাল করে দেওয়ার একটা হীন ষড়যন্ত্র। মার্কিন সেনাবাহিনী ভিয়েতনামে যে "*Strategic Village*" করেছিল, এই যৌথ খামার (আদর্শ গ্রাম) ও অনুরূপ একটা নিপীড়ন ও নির্যাতনের কোশল ছাড়া বৈ কিছু নয়। বাহ্যতঃ এইপ্রকল্পের উদ্দেশ্য—ভূমিহীন ও জুম্ম চাষীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন প্রচার করলেও মূলতঃ জুম্ম জনগণকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা নির্দিষ্ট স্থানে বন্দী করে রাখাটাই এই যৌথ খামারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই যৌথ খামার একটা বন্দী শাল ছাড়া আর কিছুই নয়। যে এলাকায় এই যৌথ খামার করা হবে, সে এলাকার গরীব জুম্মদেরকে বন্দুকের নলের মুখে যৌথ খামারে আসতে বাধ্য করা হয়। যারা আসতে চায় না তাদের উপর চরম অত্যাচার করা হয় এবং তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

অথচ লক্ষনীয় যে, সাহায্য প্রদানকারীদেশ ও সংস্থা সমূহ আর বিশ্ববিবেককে ধোঁকা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশকরণ ও সামরিক সন্ত্রাস আড়াল করার উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে চেঙ্গী মাইনী ও কাচালং উপত্যকায় সর্বমোট ২০০০ (দুই হাজার) ভূমিহীন ও জুম্ম চাষী পরিবার তথা কথিত যৌথ খামারে ১৯৮০—৮৪ সালে মধ্যে পুর্ণবাসন দেওয়ারকথা ছিল। কিন্তু অদ্যাবধি মাত্র কয়েক শত পারিবারকে ঐরূপ যৌথ খামারে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে—যৌথ খামারের প্রতিটি পরিবার আর্থিক সহ অন্যান্য যেসব সাহায্য পাওয়ার কথা ছিল সেরকম সাহায্য থেকে কিন্তু প্রতিটি পরিবারকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যদি ও কাগজে কলমে সবকিছুই ঠিক ভাবে করা হচ্ছে বলে দেখানে হয়ে থাকে।

UNICEF থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পানীয় জল সরবরাহ, বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার, সেনিটারী লেট্রিন নির্মাণ, উন্নত বীজ সরবরাহ, নার্সারী ও বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কার্যতঃ এই প্রকল্পের সাহায্যে জুম্ম জনগণের মোট জনসংখ্যার ৫%. জনের ও উপকারে আসছে না। কেননা এই প্রকল্পের প্রধান পরিকল্পনা পানীয়জল সরবরাহ শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্প, বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের শিবির ও গ্রাম, বন্দীশিবির, সরকারী অফিস আদালত ও শহরের আশে পাশের এলাকাতেই পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে। যে সব কমিউনিটি সেন্টার করা হয়েছে, প্রায়

সকল কমিউনিটি সেন্টারই সশস্ত্র বাহিনীর দখলে রয়েছে, সেনিটারী লেট্রিন সশস্ত্রবাহিনী সরকারী আমলাদের জন্য করা হচ্ছে সর্বোপরি নার্সারী ও বীজ সরবরাহ অনুপ্রবেশকারীদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

ADAB র সাহায্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণের পিছিয়ে পড়ে থাকার এটা একটা বিশেষ কারণ। জুম্ম জনগণের বহুদিনের দাবী পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিনাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগের জন্য একটা রাস্তা করে দেওয়া হউক। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন শাসনামলেই তজ্জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। যদিও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ করা হচ্ছে, কিন্তু সামরিক সরকার জুম্ম জনগনের দাবী ও মতামতের কোন গুরুত্ব না দিয়েই সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল, বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন ও যাতায়াতের সুবিধার্থে, সর্বোপরি সমতল ভূমির ব্যবসায়ীরা যাতে অবাধে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ আহরণ ও শোষণ করতে পারে তজ্জন্য সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সামরিক সরকার ইচ্ছা মতো রাস্তা তৈরী করে চলেছে। যেমন রামগড় থেকে খাগড়াছড়ি হয়ে পানছড়ি ও দীঘিনালা, রাঙ্গামাটি থেকে মহালছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা থেকে বাঘের হাট হয়ে মারিশ্যা, চিরিঙ্গ্যা থেকে আলিকদম, বান্দরবন থেকে রুমা, খাগড়াছড়ি থেকে মানিকছড়ি, মানিকছড়ি থেকে লক্ষীছড়ি, পানছড়ি থেকে লোগাং হয়ে বাবুছড়া ইত্যাদি যা মূলতঃ জুম্ম জনগণের স্বার্থে খুব কমই কাজে আসবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যেমনি অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অনুন্নত, তেমনি স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও তারা জীর্ণ শীর্ণ। ম্যালেরিয়া প্রতিবছর শত শত জুম্ম শিশু ও নরনারীর মূল্যবান জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। তাই জাতি সংঘের WHO জুম্ম জনগণের মঙ্গলার্থে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই সাহায্যে জুম্ম জনগণ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে। কেননা এই প্রকল্পের যাবতীয় ঔষধ পত্র ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাপনা মূলত ঃ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও বে-আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে জুম্ম জনগণ নামে মাত্রই এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ সামরিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৬৩ কোটি ১৩ লাখ টাকার একটি বিশেষ পাঁচশালা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। এই পরিকল্পনার অধীনে উদ্যান উন্নয়ণ, কুটীরশিল্প উন্নয়ন, সমন্বিত বনায়ন ও জুমিয়া (জুমচাষী) পুর্নবাসন পশুপালন, মৎস্যচাষ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক যোগাযোগ, টেলি যোগাযোগ, পর্যটন ইত্যাদি চমক লাগানো পরিকল্পনার কথা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়ে আসছে। আর এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু করা হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইহা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে—এযাবৎ উন্নয়নের খাতে যে নীতি ও পদ্ধতিতে অর্থব্যয় করা হচ্ছে ঠিক সে নীতি ও পদ্ধতিতে এই অর্থের সিংহ ভাগ সামরিকখাতে ও বেআইনী বাঙ্গালীমুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ দ্রুত বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা কল্পেই ব্যয় করা হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালে কর্ণফুলী বহুমুখী জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা কাপ্তাই বাঁধ নির্মানে *U S A I D* (**United States Agency for International Develodment**) আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। অথচ এই কাপ্তাই বাঁধের দ্বারা জুম্ম জনগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাবু হয়েছে, পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মুসলমানেরাই ব্যবসা বানিজ্য, শিল্প কারখানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করে উপকৃত হয়েছে।

জমি বেদখল

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উন্নয়নের নামে বাংলা দেশ সরকার কর্তৃক দেশে বিদেশে যা যা প্রচার করা হচ্ছে, তাতে সরেজমিনে তদন্ত না করলে মনে হবে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন অভাব নেই, কষ্ট নেই, নেই কোন অন্যায় অবিচার। অথচ সামরিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে জুম্ম জনগণকে চিরতরে উৎখাত করার যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, সরকারের জমি বেদখলের নীতি এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ আরো উন্মোচন করে দেয়। সামরিক সরকার একদিকে বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জমি জোর করে দখল করাচ্ছে অপরদিকে বিভিন্ন কুট কৌশলের মাধ্যমে ও জুম্ম জনগণের জমি বেদখল করা হচ্ছে। তন্মধ্যে—

১) সরকারী উদ্যোগে যেমন প্লান্টেশান, নার্সারী, বনায়ণ, পুর্নবাসন ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে সরল ও নিরীহ জুম্ম জনগণ থেকে অতি অল্পদামে ক্রয় করে জমি বেদখল করা হয়;

২) জুম্ম জনগণ অশিক্ষিত ও গরীব। তাই অনেক সময় নিজের জমির

নথিপত্র গচ্ছিত রেখে বাঙ্গালী মুসলমান মহাজন থেকে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হলে তখন ঐ মহাজন চক্রান্ত করে জমিটা বেদখল করে বসে।

৩) সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে দখলকৃত এমনকি বন্দোবস্তীকৃত জমি ও বেদখল করে নেয়। সেনাবিনাস ও সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প' তাদের বাসস্থান, খেলার মাঠ ইত্যাদির জন্য বিনা মূল্যে অথবা কোন কোন সময়ে নাম মাত্র মূল্যে জমি বেদখল করা হয়।

সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের পরিহানি

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণ বাদ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সামরিক সরকার একদিকে হাজার হাজার বাঙ্গালী মুসলমানকে বেআইনীভাবে পুনর্বাসিত করছে ও তাদের দ্বারা জমি বেদখল করাচ্ছে, অমানুষিক নির্যাতন নিপীড়ণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তথাকথিত উন্নয়নের নামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নানা ভাবে আঘাত হেনে চলেছে; অন্যদিকে জুম্ম জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিহানি করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য—জুম্ম জনগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এবং ইসলামের আচার আচরণ, কথা বার্তা ও আদব কায়দায় অভ্যস্ত করা। এছাড়া ইসলামিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট করার হীন অপচেষ্টা ও চালানো হচ্ছে। ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি অথবা জোর করে জুম্ম যুবতী ও নারীদেরকে ধরে নিয়ে বিবাহ করা ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। ইসলামিক সভা সমিতিতে বাধ্যগত ভাবে জুম্মদেরকে উপস্থিত করানো হচ্ছে; এলাকায় এলাকায় ইসলাম ধর্মের প্রচার করা হচ্ছে; বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদেরকে গোপনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন জুম্ম জনগনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করে। ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ইসলামিক প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব সাংস্কৃতিক ও প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে গরীব জুম্ম জনগণকে ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য নানা প্রকারের জন কল্যানমূলক কার্যক্রম দেখানো হচ্ছে দানখয়রাত করা হচ্ছে। মাদ্রাসা মক্তব ও মসজিদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করানো হচ্ছে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বৌদ্ধ ধর্মের চরম পরিহানি ঘটাচ্ছে। বুদ্ধ মূর্তি ভেঙ্গে দিচ্ছে ও বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে দিচ্ছে। সর্বোপরি ধর্মীয় পূজা পার্বন ও সামাজিক উৎসবে এমনকি মৃতদেহ সৎকার ও মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে ও সামরিক কর্তৃপক্ষ থেকে জুম্ম জনগণকে অনুমতি গ্রহনে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সঊদী আরব ও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশ সমূহ কোটি কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে।

জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পাকিস্তান আমল থেকে জেনারেল এরশাদ সরকারের শাসনামল (১৯৮১-৮৫) পর্যন্ত নিম্নোক্ত ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ সমূহ কার্যকর করা হয়েছেঃ—

১) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি বাতিল করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'বহিভূত এলাকার' (Excluded Are) মর্যাদা ক্ষুন্ন করে দেওয়া হয়েছে;

বেআইনী ভাবে হাজার হাজার বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশকরানো হয়েছে। এসব বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদেরকে ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহনে অধিকার দেওয়া হয়েছে।

৩) কর্ণফুলী বহুমুখী জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

৪) ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৫,০৭, ২০০ জন বাঙ্গালী মুসলমানকে বেআইনী ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। বিভিন্ন শাসনামলে পুনর্বাসিত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জনসংখ্যার হিসাব নিম্নরূপ—

ক) পাকিস্তান আমল—৬০,০০০

খ) বাংলাদেশ আমলঃ—

১) আওয়ামীলীগ—৫০,০০০

২) জিয়াউর রহমান
শাসনামল—১৫০,০০০

৩) এরশাদ শাসনামল—২৪১,২০০

[প্রায় দশ হাজার পরিবার পুনর্বাসিত এলাকা থেকে বাংলাদেশের অন্যত্র পালিয়ে যায়]

৫) যৌথ খামার ও আদর্শ গ্রাম স্থাপন করে সামরিক সন্ত্রাস চালিয়ে এবং মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে গ্রামকে গ্রাম জনমানব শূন্য করা হয়েছে ;

৬) সশস্ত্র বাহিনী ও অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালী মুসলমানদের দ্বারা শত শত ব্যক্তিকে হত্যা, হাজার হাজার লোককে পঙ্গু, শত শত যুবতী ও নারীকে ধর্ষন, শত শত ঘর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, শত ব্যাক্তিকে জেল লক্ষ লক্ষ টাকার ধন সম্পত্তি লুঠ পাট ও খাদ্যশষ্য বিনষ্ট, অগনিত নরনারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্য্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছে।

৭) বাঙ্গালী মুসলমান পুনর্বাসন ও সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং অন্যান্য হীন উপায়ে হাজার হাজার একর জমি বেদখল করা হয়েছে ;

৮) সামরিক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে জুম্ম জনগনকে ভাতে মারার ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

৯) বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা, শারীরিক নির্য্যাতন এবং পথে ঘাটে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অবমাননা করে বৌদ্ধ ধর্মের উপর আঘাত হানা হয়েছে পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের সম্প-সারন করা হয়েছে।

১০) জুম্ম জনগণের উন্নয়নে জাতি সংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের আর্থিক সাহায্য এবং সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সিংহ ভাগ অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন ও উন্নতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হচ্ছে।

১১) ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি ও বিভিন্ন প্রকারের অপকৌশলের মাধ্যমে শত শত জুম্ম যুবতী ও নারীদের হরণ করে জোর করে বিবাহ ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে ;

১২) ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ইসলামিক সাংস্কৃতিক ও প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বৌদ্ধ, হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মের উপর অশালীন ও অবমাননাকর বক্তব্য দেয়া হয়। মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে ;

১৩) আচার আচরণ, চলাফেরা, কথা বার্তা তথা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ;

১৪) আর্থিক ও নানা প্রকারের সুযোগ সুবিধা দিয়ে গরীব ও ভূমিহীন জুম্ম পরিবারদের ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত করা হয়েছে।

১৫) সরকারী ও বে-সরকারী অফিস আদালতে দারোয়ান থেকে শুরু করে সকল স্তরের চাকুরীতে বাঙ্গালী মুসলমানদের থেকে ৮৫% ভাগ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য মহকুমা জেলা ও বিভাগীয় উচ্চ পদে কোন জুম্মকে নিয়োগ করা হয়নি।

১৬) ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে একচেটিয়া ভাবে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১৭) জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম— আত্মনিয়ন্ত্রণা-

ধিকার আন্দোলন নস্যাৎ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জুম্ম জনগণের সাথে বাংলাদেশ সরকার এক অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে।

সুতরাং আজ ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে—১৯৭৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ষড়যন্ত্রের যে বীজ রোপিত হয়, তা আজ ফলে ফুলে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হওয়ার ফলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব অবধারিত অবলুপ্তির মুখে এসে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জন সংখ্যার হার—৬০%. অমুসলিম এবং ৪০%. মুসলিম বলে অনুমিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কোন অঞ্চলে বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কোন কোন স্থানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে নিম্নে সংযোজিত ১৯৭১ ও ১৯৮২ সালের মানচিত্রদ্বয়ে দেখানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১,১৬,০০০ এবং ৩টি সেনানিবাস ও কাপ্তাই সংলগ্ন নৌ ঘাঁটি সহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প সংখ্যা ৫৬ ছিল। পক্ষান্তরে ১৯৮৭ সাল নাগাদ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৪,৭৭,২০০ এবং ৩টি সেনানিবাস, নৌঘাঁটি সহ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প ১৮৭ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ১২ (বার টি থানা ছিল। পরবর্তীতে থানার সংখ্যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৮ (আটাশ) টি থানা স্থাপন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এতগুলো থানা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহা অনুমান করা হয় যে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বি. ডি, আর, এ.পি.বি, বি আর পি, পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মিলিয়ে প্রায় ৬০ (ষাট) হাজার সশস্ত্র বাহিনী সদস্য মোতায়েন রয়েছে। তন্মধ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কাপ্তাই ও বান্দরবনে সেনাবাহিনী-৪ (চার) ব্রিগেড, রাঙ্গামাটি, বান্দর বন, খাগড়াছড়ি, মারিশ্যা ও রাম গড়ে বি ডি আর ৫(পাঁচ) ব্যাটালিয়ন, বিলাইছড়ি, ঘাগড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনে—এপিবি ৫(পাঁচ) ব্যাটালিয়ন এবং ঘাগড়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনে আনসার-৪(চার) ব্যাটালিয়ন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহালছড়ি থানার অন্তর্গত *Counter Insurgency* বিষয়ে প্রশিক্ষনের জন্য মহালছড়িতে একটা *Jungle warfare School* আছে। অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্র আজ অতিদ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

বাংলাদেশ সরকার জাতি সংঘের (U. N. O.) মানবাধিকার সংস্থা এবং International Labour Organisation's Convention 107 on Tribal and indigenous populations এর এক প্রভাবশালী সদস্য। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর Universal Declaration of Human Rights এ ঘোষণা করা হয়েছে যে—

Article 3 : Every one has the right to life, liberty and the security of person.

Article 5 : No one shall be subjected to torture, inhuman degrading treatment or punishment.

Arlicle 17 : Every one has the right to own property alone as well as in association with other (1).
No one shall be arbitrarily deprived of his property (2).

সর্বোপরি জাতি সংঘ কর্তৃক আরো ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে— "All peoples have the right to Self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development· ..." আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার জাতি সংঘের একজন সদস্য ও মানবাধিকারের একজন প্রভাবশালী প্রবক্তা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি বেদখল, বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান পুনর্বাসন, হত্যা ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়ন করে বিশ্বমানবাধিকার ও সংখ্যা লঘিষ্ঠের অধিকার চরমভাবে পদদলিত করে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিচ্ছে।

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম হচ্ছে একটি ন্যায় সঙ্গত সংগ্রাম। এই সংগ্রামের জয় পরাজয়ের উপর জুম্মজনগণের বাঁচা মরা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। একদিকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম অপরদিকে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র। একপক্ষ স্বকীয় ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় আর অপরপক্ষ চির অবলুপ্তি ঘটাতে চায়। অতএব আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়, না ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ —তা একমাত্র আগামীদিনের সংগ্রামী চেতনা ও বিশ্ব মানবতাই নির্দ্ধারণ করে দিতে সক্ষম।

মানচিত্র—১৯৭৪

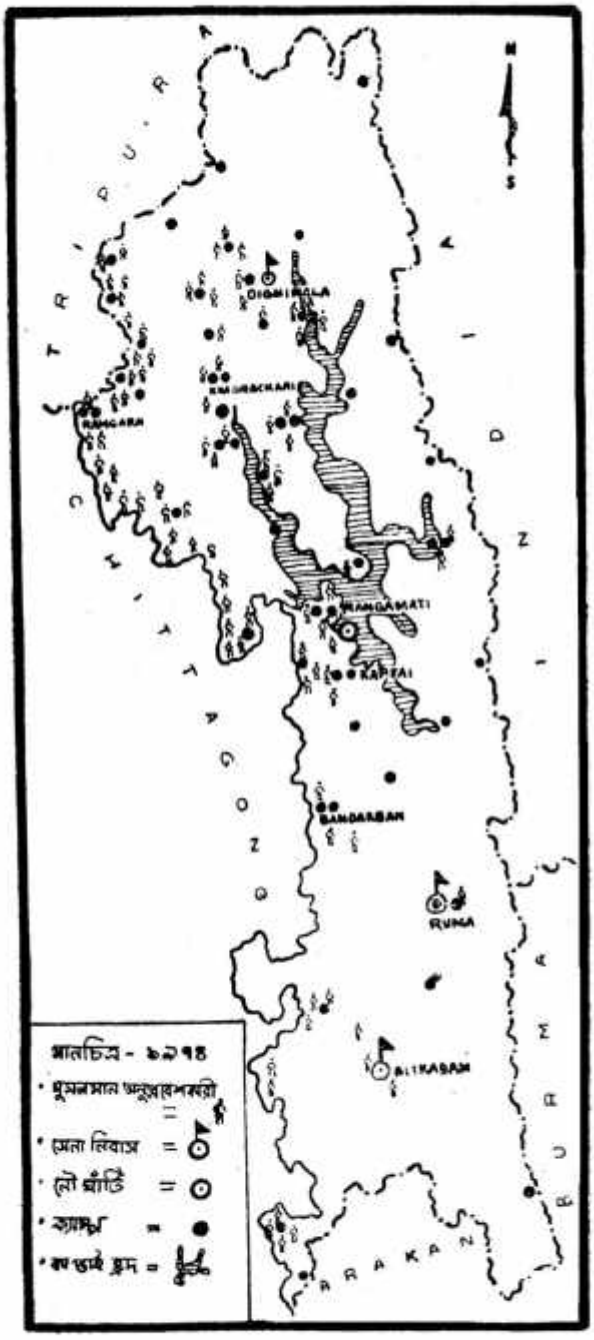

মানচিত্র—১৯৮৫

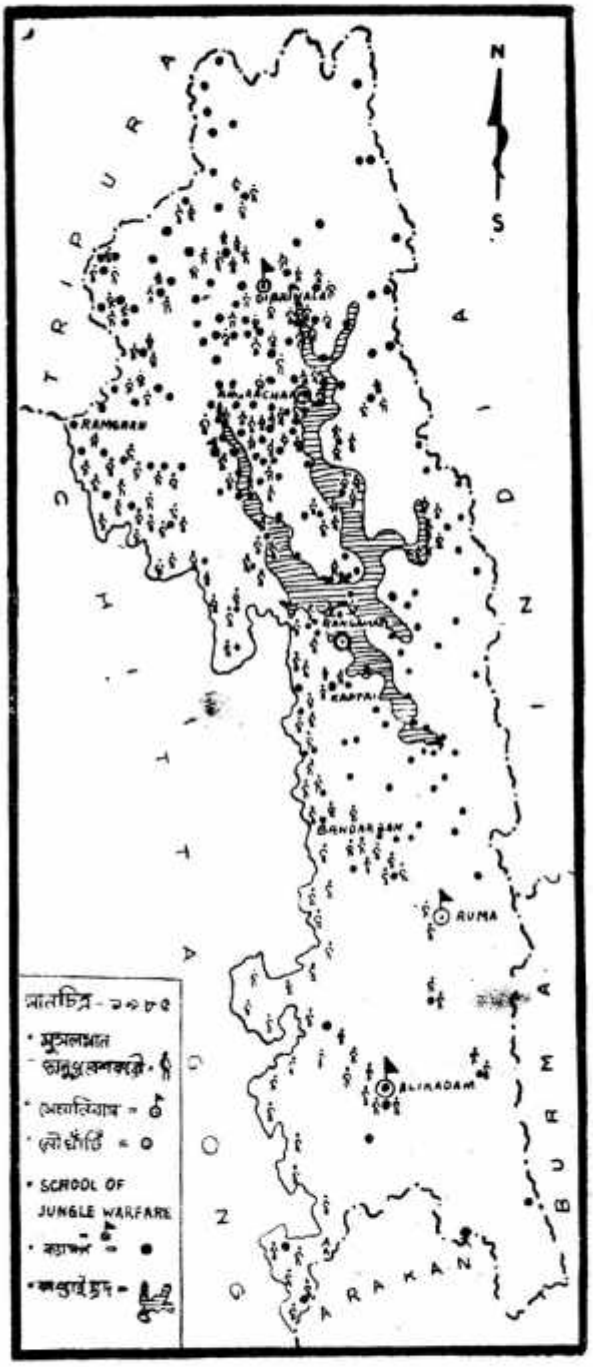

সমাপ্ত

মিজোরামে আশ্রিত ভূষন ছড়া গণহত্যার শিকার

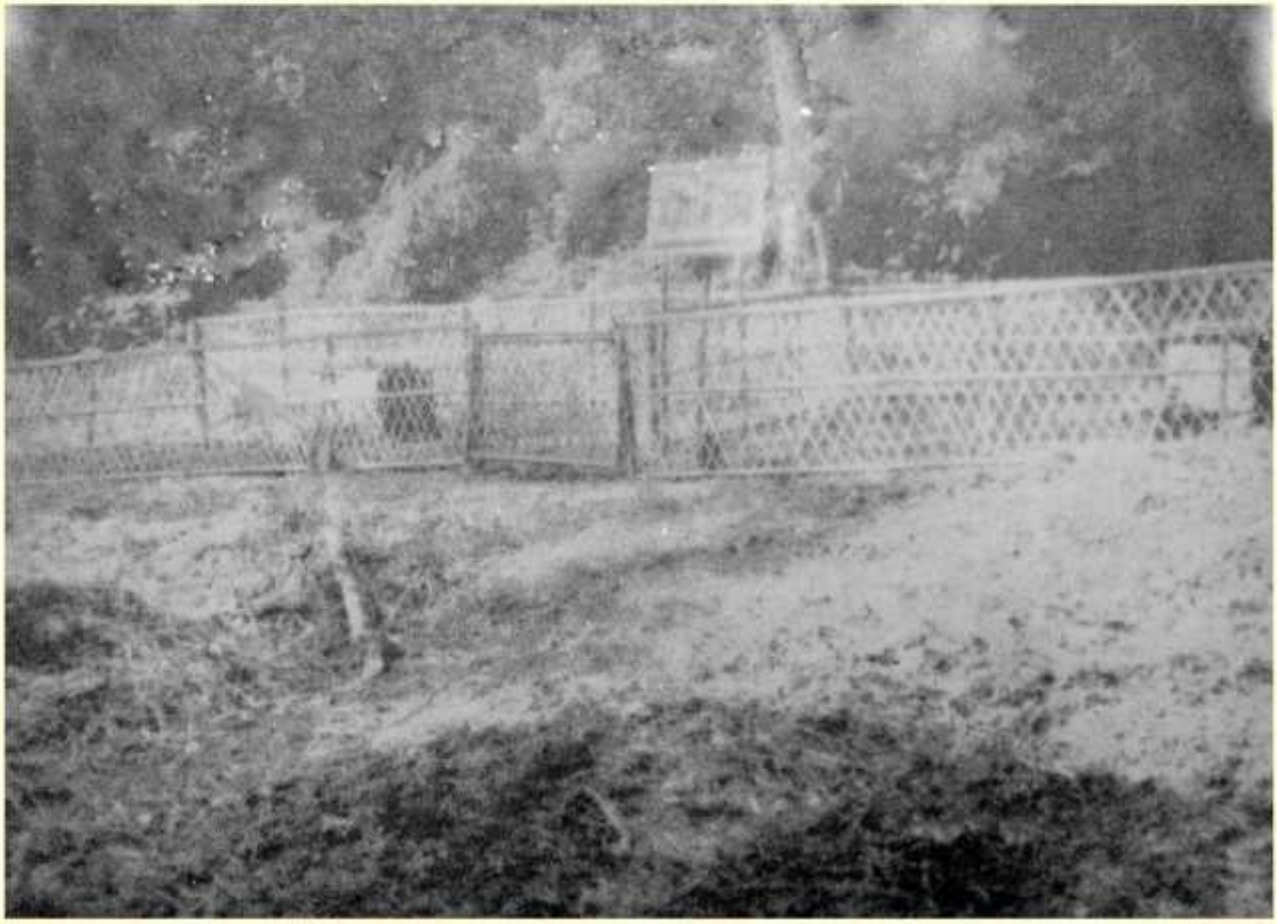

সমাধি ক্ষেত্র